SHANTIPUR LOCAL

A Bengali Novel

By

SURESH CHANDRA SAHA

প্রকাশক :
শ্রীপ্রবীরকুমার মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মুদ্রক :
এস. সি. মজুমদার
নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ
৬৮, কলেজ স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন
সরোজ সরকার

প্রথম সংস্করণ
আষাঢ়
১৩৩৯

দাম
১০.০০

এই উপন্যাস শান্তিপুরের এক কলকাতা-যাওয়া চাকুরি খোঁজা মধ্যম শিক্ষিতা মেয়ের করুণ কাহিনী। শান্তিপুর লোক্যালে কলকাতায় গিয়ে কি করে সে মেয়ে-শিকারীর পাল্লায় পড়ে ধর্ষিতা হল, শেষ পর্যন্ত কি করে এক হৃদয়বান যুবক তাকে পত্নীত্বের গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করল, এ হচ্ছে তারই ট্রাজিও-কমেডি। কিছুদিন শান্তিপুব লোক্যালে যাতায়াতে যে বিচিত্র অভিজ্ঞতা লেখকের জমার খাতায় সঞ্চয় হচ্ছিল, এটি তারই ফলশ্রুতি, লেখকেব পক্ষে মস্ত এক বাই-প্রডাক্ট্।

এই উপন্যাসের কল্পিত পাত্রী-পাত্রীর মধ্যে আপন চরিত্রগত মিল খুঁজে কেউ হযতো পাবেন, চলচ্চিত্রের পর্দায আপনাকে দেখার মতো। বলা প্রয়োজন, তা হবে নেহাতই আকস্মিক—নিজেকে যথার্থ দেখলেও লেখকের দায়িত্ব তাতে একটুও নেই।

এই উপন্যাসের ঘটনাবলী এবং পাত্র-পাত্রী সম্পূর্ণ কল্পিত।

—সুরেশচন্দ্র সাহা

ঋণ স্বীকার:

শ্রীমতী মিলন চক্রবর্তী

শ্রীসুবোধরঞ্জন চক্রবর্তী

শ্রীমৃণালকান্তি মৈত্র (কানাইবাবু)

শ্রী জে. এম. বিশ্বাস

বন্ধুবরেষু—

—এই লেখকের অন্যান্য বই—

১। চেরিফুলের দেশে

২। মালয় থেকে মালয়েশিয়া

৩। অস্ট্রেলিয়ার অন্তরে

৪। দেশ-বিদেশ

৫। মিসিসিপি উজিয়ে।

এক

রেলগেটের কাছে গিরিজা গোঁসাইকে দেখেই অসীম প্রামাণিক চীৎকার করে বলল—'গোঁসাইদা, পা চালাও—নইলে গাড়ি ধরতে পারবে না।' কিন্তু গোঁসাইদার কানে অসীমের ডাক গিয়ে পৌঁছাল না।

রেলগাড়ির দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হরিপ্রসাদ আর অসীম যেন গিরিজাশঙ্করের প্রতি পদক্ষেপ মেপে দেখছিল। গিরিজা গোঁসাই যে শেষ পর্যন্ত গাড়ি পাবে তেমন ভরসা তারা করতে পারছিল না। ঠিক তখন ফিল্ডসার্ভেয়ারের মতো দৃষ্টি নিক্ষেপ করে হারুদা মন্তব্য করলেন—'যে রেটে গোঁসাই হাঁটছে, তাতে গাড়ি পাবার সম্ভাবনা তার ফিফটি-ফিফটির বেশি নয়।'

বিনতা নন্দীও গিরিজা গোঁসাই-এর হাঁটা-পথে তাকিয়েছিল। রেল-গেটের কাছে গোঁসাইদাকে চোখে পড়ার পর দুবার ঘড়ি দেখা তার হয়ে গেছে। এদিকে গাড়ি ছাড়তে মাত্র পাঁচ মিনিট বাকি। কি জানি, গাড়ি যদি বেচারা না পায়! জানালায় হাত রেখে ঈষৎ মুখ বাড়িয়ে বিনতা পথের দিকেই চেয়ে রইল।

আজ অসীম, হরিপ্রসাদ, এমন কি বিনতা পর্যন্ত গিরিজাশঙ্করের জন্য যা কিছু করতে প্রস্তুত ছিল—অথচ তাদের কোন উপায় ছিল না। পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ্বপৃথিবীতে হয়তো কোন ওলটপালট ঘটবে না, তা নিয়ে কেউ মাথাও ঘামাবে না, কিন্তু গিরিজা গোঁসাই-এর গাড়ি-ফেল-করা অসীমদের পক্ষে মস্ত একটি ব্যাপার। দুঃখের ব্যাপার। এ যেন একান্ত বাধ্য হয়ে এক খেলোয়ার 'শর্ট' রেখে ফুটবল মাঠে

নেমে পড়া। ডান হাতে স্ট্র্যাপ-দিয়ে-বাঁধা ঘড়িতে বিনতার তৃতীয়বার চোখ পড়ল।

পান চিবুতে চিবুতে হারুদা বললেন—'গিরিজাটা যেন কেমন মাইরি! আর পাঁচটা মিনিট—'

গিরিজা গোস্বামীর পদচারণায় চোখ রেখে হারুদাকে থামিয়ে হরিপ্রসাদ ধমকের সুরে বলল—'তুমি থামো তো হারুদা! গাড়ি ধরার জন্য বেচারা প্রাণপণ করছে, আর তুমি কিনা—'

হরিপ্রসাদের কথাও শেষ হতে পারল না। 'গোঁসাইদা, পা চালাও, পা চালাও' বলে অসীম আবার চেঁচাতে শুরু করল। হরিপ্রসাদের কণ্ঠস্বর তাতে চাপা পড়ে গেল।

গোঁসাইদা, সবার সুখদুঃখের সহযাত্রী গিরিজা গোঁসাই, ভেটারেন ডি-পি গিরিজাশঙ্কর গোস্বামী সত্যি বোধ হয় গাড়ি ফেল করতে যাচ্ছে—এবং তা অতি ভদ্র শান্তিপুর স্টেশনে। এমন উত্তেজনার মুহূর্তে কি বললে, অথবা কি করলে যে কি হয়, তা কেউই তেমন বুঝতে পারছিল না। একসঙ্গে তাস-খেলা, চা-বিড়ি-খাওয়া, ডেইলি-প্যাসেঞ্জারি-করা গিরিজাশঙ্কর শুধু সহযাত্রীই নয়, শান্তিপুরের লোক। খাস শান্তিপুরের। দুঃখটা সব চাইতে এখানেই বেশি!

সত্যি করার মতো কারও কিছুই নেই। অসীম প্রামাণিক গাড়ির টাইম-টেব্‌ল নিয়ে মেতে উঠে বলল—'রেলের লোকগুলো যেন কেমন মাইরি। কেশনগরকে পথ দিতে কালীনারাণপুরে আমাদের স্রেফ পনেরো মিনিট দাঁড়াতে হয়। কোন ব্যতিক্রম নেই। সেই-পনেরো-মিনিট পর গাড়িটা শান্তিপুর ছাড়লে কোন্ মহাভারত অশুদ্ধ হয় শুনি?'

রেল কর্তৃপক্ষের তেমন কেউ হাজির থাকলে প্রচলিত টাইম টেব্‌লের সমর্থনে কি বলতেন কে জানে, কিন্তু আপন দলের হারুদা শুরু করলেন গিরিজাশঙ্করের সমালোচনা—'তোমরাও যেমন!' তাচ্ছিল্যের সুরে তিনি বললেন—'গিরিজা আসলে কি জানো? শেষ খেয়ার যাত্রী।—শোয় দেরিতে, ওঠে দেরিতে, খায় দেরিতে। তারপর

বৌয়ের ছত্রচ্ছায়ায় বসে বিড়িতে বেশ করে সুখটান দিয়ে রওনা হয়। ছুটতে ছুটতে আসে স্টেশনের দিকে। কোনদিন ট্রেন পায়, কোনদিন পায় না। অবশ্য বাড়ি থেকেই সে ভেবে রাখে—পরেরটা তো আছেই। নইলে শেষ গাড়িটা আর যায় কোথায়? ফলে আপিসে লেট, কাজে লেট, কথা শোনা!'

এই রকম পরিস্থিতিতে হরিপ্রসাদ সিং হারুদাকে উৎপাতকর উপসর্গ ছাড়া কিছুই ভাবে না। সুতরাং ফোড়ন কাটার মতো করে সে বলল—'লেকচার ফেকচার এখন শিকেয় তুলে রাখো হারুদা। আসলে তোমার কথা শুনলে মনে হয়, গাড়ি ফেল করা যেন কি পাপের কাজ!'

কিন্তু আপন বক্তব্য সমর্থনের জন্য হারুদার পুঁজির অভাব নেই। অবাক হয়ে তিনি বললেন—'লাও বাবা, পাপ-ফাপ আবার কি কথা! বলি ব্যাপার কি জানো? গাড়ি ফেল যারা করে, সাতটার বদলে গাড়ি আটটায় ছাড়লেও করবে।'

এ বিষয়ে সহযাত্রীরাও অবশ্য একমত। কিন্তু গাড়ি ছাড়ার প্রত্যাসন্ন মুহূর্তে কে আর তা নিয়ে কথা বাড়ায়? তাছাড়া হারুদা একবার কথা বলতে শুরু করলে কি আর কারও মুখ খোলার ফুরসুত মেলে?

বক্তব্য শেষ হয় নি ভেবে হারুদা আরও বললেন—'এই লেট-করা লোকগুলো কি ভাবে জানো? আটটা বাজতে এখনও ঢের দেরি আছে—আরেকটু পরে বেরোলেই ক্ষতি কি? অথচ দেরির মাত্রা যে কত বেশি হয়ে যায় সে খেয়াল রাখে না। সুতরাং সাতটাই বলো, আর আটটাই বলো, গাড়ি ফেল তারা করবেই। কোন শম্মা বলতে পারে, হারাণ বঙ্গ কখনও লেটে এসেছে, কোনদিন গাড়ি ফেল করেছে?'

অবশ্য হারাণ বঙ্গ মশাইর এ কথা বলার হক আছে। এ তার গলাবাজি-করা লেকচার নয়, নীতি। নিয়ম। লেট-না-করার নীতি। এই নীতি আর নিয়মগুলো তিনি শুধু নিজেই যে পালন করেন তাই

নয়, অপরকেও মেনে চলতে উপদেশ দেন। বছর কয়েক আগে অসীম প্রামাণিক যখন ডেইলি প্যাসেঞ্জারির কক্ষপথে এসে জুটেছিল, হারুদা গম্ভীর হয়ে বলেছিলেন—'ভায়া, জীবনে তিন সেনকে সব সময় এড়িয়ে চলবে।'

অসীম অবাক হয়ে বলেছিল—'অর্থাৎ!'

কারণ আছে। রাখাল সেন তার বন্ধু লোক। প্রাণের বন্ধু। এই বন্ধুতার সূত্রেই অসীম নিশ্চিত সিদ্ধান্ত করেছিল, সেনেদের মতো বন্ধু হয় না। অসীম ক্ষুণ্ণ হয়ে ভেবেছিল, হারুদা বোধ হয় তার সেন-ধারণা পাল্টে দিতে শুরু করেছেন।

হারুদা অবশ্য ব্যাখ্যা করে পরে বলেছিলেন—'প্রথম ধর, 'কাল সেন' অর্থাৎ ব্যাপারটি যখন কালকের, তা নিয়ে আজ মাথা ঘামিয়ে কি হবে গোছের মনোভাব। মারাত্মক মনোভাব, বটে কি না?' অসীম অনুমোদনের হাসি হেসেছিল।

'দু'নম্বর সেন কে জানো?' হারুদা বলেছিলেন—'ইস্টিসেন। রেল-স্টেশন যাদের বাড়ির কাছে তারা কিন্তু হামেশা ভাবে, দেরি করে বেরোলেও ক্ষতি নেই। ফলে গাড়ি ফেল করে তারাই বেশি।'

'তিন নম্বর সেনকে চিনতে পারছ না?' শেষ সেন-রহস্য উন্মোচন করতে করতে হারুদা বলেছিলেন—'বত্তি সেন, যাকে বলে ডাক্তার। ফোঁড়া উঠেছে হাতে—তার জন্য রক্ত-পেচ্ছাব-মল পরীক্ষা করাবে, বুকের এক্স-রে নেবে। সুতরাং জীবনে ডাক্তারকে সব সময় এড়িয়ে চলবে, বিশেষ করে তোমাদের নরেশ সান্যালকে।' প্রতিবাদ না করলেও কথাটি অসীমের ভাল লাগে নি। নরেশ ডাক্তারের বিরুদ্ধে অসীমদের কোন অভিযোগই নেই।

কিন্তু নবীন ডেইলি প্যাসেঞ্জারকে তিন রকম সেন চিনিয়ে দিয়ে হারাণ চন্দ্র বঙ্গ মনে বড় তৃপ্তি পেয়েছিলেন। প্রবীণ এবং অভিজ্ঞ অভিযাত্রী হিসেবে এইটুকু না করলে কি আর চলে, নাকি ভাল দেখায়? কিন্তু শুধু অসীম প্রামাণিকই নয়, শান্তিপুরের বিস্তর ছেলে-ছোকরা

হারুদার কাছে তিন-সেনের ব্যাখ্যা শুনেছে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারির প্রথম অভিষেক দিনে তার অমূল্য উপদেশ লাভ করেছে। ফ্রি।

গিরিজা গোঁসাই যেমন শেষ মুহূর্তে এসে গাড়ি ধরে, হারুদা রোজ তেমনি অ-শেষ মুহূর্তে স্টেশনে আসেন, গাড়ি ছাড়ার অন্তত কুড়ি মিনিট আগে—এসে স্টেশনের বেঞ্চে বসে তামাসা দেখেন, বিড়ি টানেন এবং মনে মনে হামেশা সিদ্ধান্ত করেন, ছুনিয়াটা দিন দিন সত্যি গোল্লায় যাচ্ছে। সবাই ভাবে—লোকটা বোকা নাকি। এতো আগে স্টেশনে এসে চুপচাপ বসে থাকে। হারুদার মতামত এ বিষয়ে অবশ্য সুচিন্তিত—'সংসারে বোকা হওয়া ভাল!'

আজ গিরিজা গোস্বামীর যতো সমালোচনাই যে করুক, তার প্রতি একটি জিনিসের অভাব কোন সহযাত্রীবই ছিল না—সহানুভূতি। নইলে কি আর তার বিলম্বিত আগমন সত্ত্বেও বিরক্ত না হয়ে সবাই উৎসুক মুখে বলে—ঐ যে গোঁসাইদাকে দেখা যাচ্ছে, উই আসছে। ইস, আর ছুটো মিনিট।

গিরিজাশঙ্করের হাঁটার গতি বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেখাই-যাক-না-ধরতে-পারি-কিনা ভাবতে ভাবতে শেষ পর্যন্ত গোঁসাই যখন প্ল্যাটফরমে পা রাখল, গাড়ি তখন স্টার্ট নিয়েছে। বৈশাম্পায়ন বটব্যাল ঠিক তখন ভাবল, একটা কিছু করা দরকার। ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে শক্ত হাতে রড ধরে এবং আরেক হাত যথাসম্ভব বাড়িয়ে দিয়ে সে বলল—'উঠে আসুন গোঁসাইজী।' কিন্তু গোঁসাইজী মনস্থির করার আগেই গাড়ির এঞ্জিন ঘস-ঘস-ঘস, তারপর ঘস্টাং ঘস্টাং শব্দ করল—সেই শব্দের ছন্দে তাল মিলিয়ে হঠাৎ বেগের স্পর্দ্ধায় বেরিয়ে গেল গাড়ি, তিনশ চৌত্রিশ নম্বর ডাউন শান্তিপুর লোকাল।

বিনতা নন্দী আজ বিশেষ দৃষ্টি নিয়ে বৈশাম্পায়নকে দেখছিল, মনে মনে অকারণে খুশি হয়ে ভাবছিল—আশ্চর্য। কেমন বীর ভঙ্গিতে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক গিরিজা গোঁসাইকে তুলতে গিয়েছিল। কজন আর গাড়িতে উঠে এমনটি করে, কজনকেই বা এমন মানায়। কিন্তু পা পিছলে যদি পড়ে যেতো! ভাবতে ভাবতে শিউরে উঠেছিল

বিনতা। অবশ্য একটু পরই 'ধ্যেৎ আমি কি সব ভাবছি' বলে নিজেকে সে সামলে নিয়েছিল। খুব সঙ্গোপনেই। ভাগ্যিস মনটাকে কেউ দেখতে পায় না, ভাবনাগুলো কেউ টের পায় না!

বৈশাম্পায়নকে বিনতা আরও খানিক তাকিয়ে দেখল। নেহাত অলক্ষ্যে। হঠাৎ তার ছেঁড়া ছেঁড়া ভাবনাগুলো পাল্টে যেতে শুরু করল। মনে মনে সে বলতে লাগল—'ভদ্রলোক যেন কেমন—ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে, অথচ রোজ এক-কামরায় ওঠে না। আজ এখানে, কাল ওখানে। এমন করলে কি আর গাড়িতে বন্ধু জোটে, নাকি কেউ জায়গা রাখে!'

উপরোক্ত মতামতটি আসলে প্রকাশ করেছিলেন হারুদা স্বয়ং। বৈশাম্পায়নের প্রথম ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা মাস খানেকের মধ্যে। অথচ বৈশাম্পায়ন বটব্যাল নিজে কিন্তু কখনও আশা করে না, কেউ তার জায়গা রাখবে, কাছে ডেকে বলবে—এখানে বোসো।

বৈশাম্পায়নের বৈচিত্র্যের অন্ত নেই। প্রথম বৈচিত্র্য তার নাম। এমন একটি ওজনে-ভারি নাম নিঃশব্দে সে বহন করে, অসঙ্কোচে ব্যবহার করে। স্বর্গবাসিনী জননীর মহাভারত-ভক্তি কুণ্ঠিত করতে সে প্রস্তুত নয়, কারণ নামটি তিনিই রেখেছিলেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার, এমন নামের গাম্ভীর্য আশাতীত রকমেই সে বজায় রেখেছে—দেশে কিংবা বিদেশে কোনমতেই তা ক্ষুণ্ণ হতে দেয় নি, ইয়ার বন্ধুরাও পরিহাস করে কখনও বলে নি—অথ বৈশাম্পায়নঃ উবাচ!

বৈশাম্পায়ন বটব্যাল ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছে বটে, কিন্তু অন্যের সঙ্গে তার অনেক তফাত। হন হন করে সে যখন গাড়িতে এসে ওঠে, তখন মনে হয়, কোথায় সে যাবে, কোন মাটিতে তার মনের শেকড় ছড়িয়ে আছে, তা যেন মোটেই জানা নেই। ওদিকে আবার পোশাক-আশাকেরও কোন ছিরি নেই। মোজা-পায়ে ফিতা-হীন জুতো, গায়ে বোতাম-খোলা শার্ট, পরণে প্রায় ঢোলা প্যান্ট, ব্যস—দিনের পর দিন দিব্যি তাতে চলে যায়। নীল পাতলুনের সঙ্গে ঘন হলুদ বুশ শার্ট কে তাকে কিনে দেয়, আর কেই বা পরতে বলে, কেউ কিন্তু ভেবে পায় না।

অবশ্য বৈশাম্পায়নের চেহারা মোটেই বেখাপ নয়—গড়ন পাতলা ধরণের, রং উজ্জ্বল শ্যাম, চুল নিকষ কালো। সবার সঙ্গে দিব্যি সে মেশে, কিন্তু মিলে যায় না; মহিলা দেখলে ট্রামে-বাসে-ট্রেনে নিজের সিট সে ছেড়ে দেয়, অথচ সংলগ্ন আসন খালি হলেও সেখানে বসে না। সবার সব কথা শুনতে সে আগ্রহী, কিন্তু নিজের কথা এড়িয়ে চলে। অথচ পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে খুব যে সে উদাসীন এবং অমনোযোগী, তাও নয়।

কামরার মধ্যে তখনও তেমন গাদাগাদি অবস্থা নয়; কিন্তু এমনটি আর থাকছে কৈ? সমস্ত ট্রেনের মধ্যে এটি কিন্তু এক বিশেষ কামরা—দু'নম্বর বগীর দ্বিতীয় কক্ষ। ভিড় এখানে সব চাইতে বেশি—তারপরই লেডিজ কামরার পরেরটিতে। চট করে কাউকে খুঁজে বের করবার জায়গা আসলে এই দুটিই। আমি এটায় থাকব, কিংবা ওটায় থাকব, ব্যস—এই বললেই যথেষ্ট। হন্তদন্ত হয়ে তা হলে আর কাউকে আগাপাস্তলা করতে হবে না, হন্যে হয়ে ছুটতে হবে না।

থ্রি থারটিফোর শান্তিপুর লোকাল বড় ভদ্র গাড়ি—যাত্রীদের মনের আনন্দে বহন করে, নিরাপদে যাতায়াত করে; দুর্ঘটনা তার নেই বললেই চলে। লেডিজে জায়গা থাকলেও অনেক মহিলা দু'নম্বর বগীতেই ওঠেন; অনেক উটকো পুরুষ যাত্রীও। শান্তিপুর থেকে আজ পাঁচজন মহিলা আগেই উঠে এসেছিলেন। সবাই কিন্তু ডি-পি। ডেইলি প্যাসেঞ্জার। রাণাঘাট, চাকদা, কল্যাণী, নৈহাটি এবং ব্যারাকপুরে আরও যথাক্রমে আট, পাঁচ, চার, ছয় এবং তিনজন মহিলা-ডি-পি উঠবেন। শান্তিপুরওয়ালীরা রাণাঘাটিনীদের আসন রেখে এসেছেন, রাণাঘাটওয়ালীরা চাকদাবাসিনীদের আসন সংরক্ষণ করেছেন—সবাই মিলে বাকি সঙ্গিনীদের আসন এমনি করে রেখে চলবেন, রক্ষা করে চলবেন। নইলে আর ডেইলি প্যাসেঞ্জার কিসের!

বিনতা নন্দী জানালার ধারে বসে অপসৃয়মান মাঠগুলিতে এমন করে চোখ রাখছিল, যেন দেখতে আর কিছু বাকি না থাকে। বৈশাম্পায়ন বিনতার শুধু সামনেই নয়, একেবারে মুখোমুখি বসেছিল এবং সাবধানে সঙ্গোপনে তাকে লক্ষ্য করে দেখছিল।

বিনতা সুন্দরীই বটে, একেবারে শরৎচন্দ্রের উপন্যাস-নায়িকার মতো। রং তার লোভনীয় রকমে ফরসা, চোখ সতেজ, মুখশ্রী মনোরম এবং যাকে বলে প্রথম দর্শনে প্রেমে পড়ার মতো। কিন্তু সব চাইতে বড় সৌন্দর্য তার দুটি ঠোঁট, কামনার রসে যেন টুপটাপ। অল্প হাসিতেই ঠোঁটদুটো তার ফাঁক হয়। কিংবা ঠোঁট ফাঁক হলেই অক্লেশে অনায়াসে হাসি বেরোয়। মিষ্টি মিষ্টি হাসি। কানের গোড়া পর্যন্ত সে-হাসি ছড়িয়ে পড়ে।

ভরাট মুখের তুলনায় কিন্তু বিনতার হাত দুটি কিছু ক্ষীণ, তাতে মাংসের ভাগে অল্প একটু ঘাটতি আছে—এবং পুরুষের হাতের মতো না হলেও অল্প কিছু লোমশ। বিধাতার কারখানায় এমন হাতের ব্লু-প্রিন্ট যে কেন তৈরী হয় কে জানে। তার হাতের দিকে দৃষ্টি পড়লে একান্ত অজ্ঞাতসারে সবাই ভাবতে থাকে, বিনতার পা দুটিও নিশ্চয় লোমশ এবং কালো কালো লোম পায়ের গোড়ালিতে এসে ঠেকেছে। সায়া-শাড়িতে ঢাকা থাকে বলে সে-লোম তারা দেখতে পায় না।

বিনতা নন্দী যথারীতি উল বুনছিল। চলন্ত গাড়িতে এটি যেন না করলেই নয়। তার উল-বোনা গতি কমতে দেখে বৈশাম্পায়নই আলাপের সূত্রপাত করল, একরকম গায়ে পড়ে—'কি ব্যাপার আপনার হাত চলছে না কেন?' কথার সঙ্গে বৈশাম্পায়নের মুখে হাসির অভাব ছিল না।

বিনতা প্রথমে চোখ তুলে চাইল, তারপর নিজের অজ্ঞাতেই একটু নড়েচড়ে বসল। তার মুখ খুলতেই প্রথমে বেরোল একটু হাসি, তারপর একটি কথা—'হাত কি আর গাড়ির মতো চলতে পারে।'

'গাড়ির মতো!' বৈশাম্পায়ন কিছু অবাক হয়ে বলল—'তা কি আর পারে! আমি কি ভাবছিলাম জানেন? বেশ তো উল-বুনছিলেন—হঠাৎ বন্ধ হল কেন?'

'উল বুনলে সময় কাটে, হাত গুটিয়ে বসে মাঠ দেখলেও মন্দ কাটে না। চলতি পথে সময় কাটাই তো বড় কথা।'

'মাঠ দেখলে না হয় সময় কাটল, কিন্তু উল-বোনা বন্ধ হলে শীত কাটবে কেন?'

'এবারকার মতো শীত তো কেটে যাওয়ার পথেই। আসছে শীতে উল বুনলেও দিব্যি চলবে।'

সামান্য হেসে সন্তর্পণে বৈশাম্পায়ন বলল—'ওহ্, উল-বোনা তা হলে আপনার ভবিষ্যতের জন্য!'

বিনতার গালে একটু রঙের আভাস দেখা দিল—যেন বৈশাম্পায়ন মনের আসল জায়গাটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করে একটি বহু-ইচ্ছিত রঙের তুলি বিনতার গালের উপর টেনে নিয়েছে। বিনতা কি একটা বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ জানালাটি পড়ে গিয়ে ঠাণ্ডা হাওয়ার তোড় এসে তার মুখে লাগল, সেই সঙ্গে এক গুচ্ছ চুল তার কপালের উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে নাকের কাছে ঝুলতে লাগল। সেই ঝুলন্ত কেশগুচ্ছে ভাগ-হওয়া বাঁচোখের যে দুফালা দৃষ্টি বৈশাম্পায়নের চোখে পড়ল, তাতে আকাশ-কাটা বিজলীর দীপ্তি ছিল।

ছন্দে ছন্দে গাড়ি চলছে। শান্তিপুর-কলকাতার লোকাল গাড়ি। তার চলার ছন্দে নিজের কল্পনা জুড়ে দাও, মনের কথা আওড়ে যাও—চক্রঘর্ষণের তালে তালে গাড়ি ঠিক তাই বলবে। ছেলেবেলায় বৈশাম্পায়ন কতদিন কান পেতে শুনেছে, গাড়ি যেন বলছে—'বেগুন-বাড়ি ময়মনসিং, ঢাকা যেতে কত দিন।' বৈশাম্পায়নের মুখে উল-বোনা মন্তব্যের মধ্যে কোন নিগূঢ় ইঙ্গিত ছিল কিনা কে জানে, কিন্তু বিনতা কথাটিকে মনের মধ্যে আবেগের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছিল—যেন এমনটি সে অনেকদিন কারও কাছে শোনার অপেক্ষায় বসেছিল, আজ তার দেখা পেয়েছে। আজ এইমাত্র কান পেতে সে যেন শুনতে পেল তার মনের কথার প্রতিধ্বনি। গাড়ির চলন্ত চাকাগুলো যেন বৈশাম্পায়নকে ডেকে ডেকে বলছিল—'এই কামরায় রোজ এসো, এই কামরায় রোজ এসো।'

মনের কথা লুকিয়ে মুখের ভাব না পাল্টে বিনতা এবার বলল—

'বর্তমান-ভবিষ্যতের কথা হচ্ছে না। কিন্তু শুধু উল বুনেই কি আর আমাদের সময় কাটে?'

'আর কি করেন শুনি?' বৈশাম্পায়নের প্রশ্নে এমন একটি ঢং প্রকাশ পেল, যেন বিনতার সময় কাটাবার উপায়গুলো তার জানা দরকার।

বিনতা জবাব দিল—'করার মতো অনেক কিছুই তো আছে—বই পড়া—'

'কি বই পড়েন? ডিটেক্‌টিভ, নাকি সাদা'সিধে উপন্যাস?'

'আগে অ-ডিটেকটিভ উপন্যাসই পড়তাম, এখন সইতে পারি না। মনে বড্ড ধাক্কা লাগে।'

বৈশাম্পায়ন কিছু অবাক হল। উপন্যাস আজকাল সে নিজেও পড়ে না, এককালে পড়ত বটে। কিন্তু বিনতার মতো মন নিয়ে সে হয়তো পড়ে নি, বিচারও করে নি। তাই এবার সে বলল—'কি জানি, উপন্যাসে আপনার মনে কেন ধাক্কা দেয় বুঝতে পারছি না।'

বিনতা সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল—'আমাদের সব কথা কখনও কি বুঝতে পেরেছেন?'

একটি বিষয় বৈশাম্পায়নের নজর এড়াল না—বিনতার 'আমাদের' বলার ধরণ, একসঙ্গে অন্যকে একাকার করার কায়দা। সমস্ত মেয়ে জাতকে। বিনতাকে উল্টো প্রশ্ন করতে শুনে বৈশাম্পায়ন বলল—'ব্যাপার কি জানেন? আপনার মতো করে আমি যদি বলতে পারতাম—সময় কাটে না!'

বিনতা চট করে বাধা দিয়ে বলল—'আপনি বুঝি খুব ব্যস্ত লোক?'

'ঠিক তাও নয়'—বৈশাম্পায়ন আমতা-আমতা করতে লাগল।

মুখে দুষ্টু হাসি ফুটিয়ে বিনতা বলল—'সময় হয়তো আপনারও ঠিক কাটে না, রোজ তাই কলকাতায় যান। অথচ কলকাতা আপনার কর্মস্থল নয়। ঠিক কিনা বলুন।' এরপর আরও একটু রহস্যের হাসি হেসে বিনতা বলল—'জানেন তো, আমরা ডেইলি প্যাসেঞ্জার।'

বৈশাম্পায়ন ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের কখনও সর্বজ্ঞ [illegible]ন করে না। তবু বিনতার কথায় নিজের মুখে হাসি ফোটাতে হল। [illegible] ন মনে সে

কিছু ভাবিতও হল। কারণ আছে। সিন্ধুপারের প্রবাসে তাকে পড়ে থাকতে হয়। কর্মসূত্রে। দীর্ঘ ছুটিতে ঘরে ফিরে কেবলই এবার সে ছুটে ফিরছিল। অতীতের শান্তিপুর এবার তাকে ভাবিয়েছিল, বর্তমানের শান্তিপুর তাকে আকৃষ্ট করেছিল। সেই সূত্রেই শান্তিপুরের সঙ্গে যতো তার যোগাযোগ, যতো সব তৎপরতা। আসলে শান্তিপুরকে জানার তৎপরতা, যা শেষপর্যন্ত ছোট একটি গবেষণার রূপ নিয়েছিল। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি প্রকৃতপক্ষে তার শান্তিপুর-গবেষণার নিত্যশ্চল অঙ্গ ছাড়া কিছুই নয়। কিন্তু কে জানে, কার কোন্ প্রশ্নে কি উত্তর সে দিয়েছিল, কি অর্থে কে বা তা প্রচার করেছে।

চিন্তার গতি তার পরিবর্তিত হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত বৈশাম্পায়ন মনে মনে সিদ্ধান্ত করল, কলকাতা যে তার কর্মস্থল নয়, সে কথা জানাজানি হলে এমন কিছু এসে যায় না।

বেচারা বৈশাম্পায়ন বটব্যাল। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে করে নিয়মিত সে কলকাতায় যায়—আপন ব্যস্ততায় ঘোরে ফেরে। কত-দিনই সে মনে মনে ভাবে, এবার লক্ষ্মী ছেলের মতো চুপটি করে ঘরে বসে শুধু বই পড়বে। পারে না। অকাজের অনেক বন্ধন এসে তাকে ঘিরে ধরে, আর ঘর থেকে সে ছিটকে পড়ে বাইরে—তারপর বিরামহীন ছুটতে থাকে। নইলে যেন মুক্তি নেই। জীবজগতে কুকুরের মতো অবস্থা আর কি—কোন কাজ নেই, অথচ দৌড় ছাড়া সে চলতে পারে না।

দুই

শান্তিপুর লোকাল রাণাঘাটে এসে দাঁড়িয়ে আছে। শান্তিপুর, ফুলিয়া, হবিবপুর, কালীনারায়ণপুর—তারপরই রাণাঘাট। কালীনারায়ণপুরে থ্রি থারটি ফোর ডাউন শান্তিপুর লোকাল আজও যথারীতি পনেরো মিনিট অপেক্ষা করেছিল, কারণ কেশনগর লোকালকে আগে বেরিয়ে যাবার পথ না করে দিলেই নয়। কিন্তু শান্তিপুরীদের মনের শান্তি রোজই তাতে কিছু বিঘ্নিত হয়, এবং এজন্য কেশনগর লোকালটিকেই তারা শুধু ঠোকে না, কৃষ্ণনগর শহরের লোকগুলোকেও ছেড়ে কথা কয়না—যেন নিজেদের সুবিধার্থে গাড়ির টাইম টেব্‌ল তারাই তৈরী করে দেয়।

হরিপ্রসাদ সিঙির কথায় বেদম ঝাঁঝ প্রকাশ পেয়েছিল—'শালা কেশনগর যেন লাটসাহেবের গাড়ি—যে যেখানে আছ সরে যাও, থেমে যাও, পথ ছাড়ো, হেহ্‌!'

হারুদাও তার বক্তব্য রেখেছিলেন—'লাটসাহেবের গাড়ি কাকে বলে জানো তো হরিপ্রসাদ? জিলিপিকে। রামকেষ্ট পরমহংস তাই বলতেন। তাঁর খুব প্রিয় খাবার কিনা! যতই পেট ভরা থাক, গলা বেয়ে নেমে যেতে জিলিপির পথ তৈরী করে তিনি দিতেনই।' বিচিত্র নয়, হারাণ বঙ্গ মশাই আজকাল নিয়মিত কথামৃত পড়েন, শনিবারে হাফ-ডে করে বেলুড় দক্ষিণেশ্বরেও ঘুরে বেড়ান।

গিরিজা গোস্বামীও চুপ করে বসে ছিল না। পাঁচ ফোঁড়নের মতো ছ্যাঁক করে উঠে সে বলেছিল—'কিন্তু কেশনগরের কি আর মিষ্টত্ব আছে, আছে শুধু জিলিপির প্যাঁচ—আমাদের শালা পথে বসাবার যম।'

কিন্তু শান্তিপুরওয়ালারা কেশনগর লোকালের উপর হাড়ে হাড়ে চটা হলে কি হবে, কালীনারায়ণপুর জংশনে দীর্ঘ পনেরো মিনিট বসে

থাকা ছাড়া তাদের উপায় নেই। অথচ গাড়িতে বসে কি আর করার মতো কিছু আছে?—গ্যাঁজাও, মাঠঘাট ছাখো, নয়ত চুর্ণীনদীর জল—শাস্ত, নীল-নীল, অতলস্পর্শ।

সে অনেক দিন আগের কথা। দেশ বিভাগ তখন হয়ে গেছে। চুর্ণী নদীতে ইলিশের ঝাঁক এলো—গঙ্গা থেকে উজিয়ে-আসা ইলিশ। চুর্ণীপারের লোকের সে কি উল্লাস। গঙ্গানদী শান্তিপুরেব খুব কাছে নয় বলে ইলিশ ধরা সেখানে আজ বড় কেউ দেখতে পায় না। কালীনারায়ণপুরে গাড়ি এলেই শান্তিপুরের ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা আজও নাকি তাই সজাগ হয়—চুর্ণীর পুল থেকে যদি ইলিশ চোখে পড়ে।

'কেশনগর' তখনও রাণাঘাটে দাঁড়িয়েছিল; 'শান্তিপুর' প্ল্যাটফরমে ঢুকতেই ছেড়ে দিল। তিনশ চৌত্রিশ নম্বর শান্তিপুর লোকালে সঙ্গে সঙ্গে ওঠবার জন্য সে কি হুড়োহুড়ি। যাত্রী উঠছে, তাদের মাল উঠছে, আর উঠছে চাল-পাচার করা মেয়ের দল। তাদের হাতে চালের থলে, কোলে ছেলে; নয়ত হাতে-কোলে-কাঁখে শুধুই চালের থলে। কেউ হেঁটে, কেউ ছুটে, কেউ কেউ আবার হাঁপাতে হাঁপাতে এসে গাড়িতে উঠছিল। কিন্তু চোখ ছিল তাদের পুলিস-হোমগার্ডের দিকে। তারা যেন শত্রুপক্ষের লোক। বুক ধরফর করছিল বটে, কিন্তু কারও কারও মুখে মিলিগ্রাম মাপের হাসিও ছিল। গরিবী হাসি। অসহায়, কুন্ঠিত, আড়ষ্ঠ। কলকাতা তখনও অনেক দূর। গাড়িতে মাল উঠলেই তো আর হল না—ভালয় ভালয় মহাজনের ঘরে পৌঁছানো চাই। মাল বেচলে তো মান রক্ষা।

পুলিস হোমগার্ড চালওয়ালীদের আজ অবশ্য কিছু বলে নি—যেন দেখতে পায় নি এমনি করে এড়িয়ে গেছে। কিন্তু আজ গোল বাঁধিয়েছে কিছু গাড়ির লোক। শান্তিপুর লোকাল যে মালগাড়ি কিংবা চাল-গাড়ি নয়, যাত্রী-গাড়ি, সে কথা বার বাব স্মরণ করিয়ে দিতে তারা ভুলছে না। অথচ ব্যাপারটি আসলে কিন্তু চাল পাচারও নয়। চালের ব্যবসাও নয়—নিরুপায় নিঃসন্তান কিছু মেয়ে মানুষের জীবন

সংগ্রাম। যাদের স্বামী নেই, সঙ্গতি নেই, পেট ভরা আছে শুধু ক্ষুধা, তাদের আর কি গতিই বা আছে। নইলে কোন্ ঘরের কোন্ মেয়ে ধরপাকরের ভয়ে ভীত হয়ে, রুষ্ট যাত্রীর চোখরাঙানি হজম করে, থলে বস্তার গুরুভারে পিষ্ট হয়ে এমন টানা-হিঁচড়ের কাজে নামে—না সখের কাজ, না সুখের কাজ!

বৈশাম্পায়ন বটব্যাল চালওয়ালীদের সঙ্গে আগেই আলাপ জুড়ে দিয়েছিল, ফেলুর মাকে শুধিয়েছিল—'সকালে ভাত খেয়েই বুঝি গাড়ি ধরতে বেরিয়ে পড়?'

'ভাত!' অবাক হয়ে ফেলুর মা বলেছিল—'রেঁধলে তো ভাত খাব! চাল পাব কুথাকে! চা-পানি ছোলা-মুড়ি খেয়েই কোন মতে দিন কাটিয়ে দেই।'

চালের কারবার-করা ছোলামুড়ি-খাওয়া ফেলুর-মার বয়স তিরিশের বেশি নয়। কিন্তু মুখ শুকনো। গায়ে গোস্ত নেই—লজ্জা নিবারণে মোটা সুতোর তাঁত কাপড়। হঠাৎ-কলেরায় যখন তার দিন-মজুর স্বামীর মৃত্যু হয়েছিল, ঘরে কিছু-বলতে-কিছুই ছিল না—শরীরও তার সুস্থ ছিল না; অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় তাকে চালের ধান্দায় বেরোতে হয়েছিল, পলাশী থেকে লাগগোলা প্যাসেঞ্জারে উঠতে হয়েছিল। আজও সে-ওঠানামার বিরাম নেই। চাল বয়ে চাল বেচে রোজ বাড়ি ফিরতি-পথে দুটি চাল সে বাড়ি নিয়ে যায় বটে, কিন্তু সে তার ফেলুর জন্য···দিনান্তে সেই তার পুত্রস্নেহের উপহার! ফেলু তো আর মায়ের মতো হরিমটর চিবিয়ে থাকতে পারে না।

'ছেলেকে তোমার রেঁধে দেয় কে?'—বৈশাম্পায়ন শুধিয়েছিল।

'কে আর দেবে, ভগমান দেয়' বলেই বোধ হয় ফেলুর মা ভেবেছিল, তার ছেলে-দেখাশোনার ভার আসলে ভগবান তো আর গ্রহণ করে নি। এক স্নেহময়ী প্রতিবেশিনীর কোমল মুখটি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তার স্মরণ হয়েছিল। আর তখনই বলেছিল—'ভুলুর মা আছে। দুটি চাল, কটি পয়সা, আর আমার ফেলুকে তার কাছে ফেলে রেখেই তো আমি বেরিয়ে পড়ি। কি করব বাবু, ফেলু বড্ড কাঁদে। বাচ্চা

ছেলে। মা ছাড়া থাকতে পারে!' পুত্রস্নেহাতুরা দীনদরিদ্রা জননীর দুচোখ ছল ছল করে উঠল।

কালীতারাকে বৈশাম্পায়ন কিন্তু প্রথমেই শুধিয়েছিল—'তোমার বাচ্চা কটি?'

অপ্রসন্ন চোখে কটমট করে তাকিয়ে কালীতারা জবাব দিয়েছিল—'পাঁচটি।'

বৈশাম্পায়ন বটব্যাল অবাক হয়ে প্রতিধ্বনি করেছিল—'পাঁ-চ-টি!'

কালীতারা খচে গিয়ে তাকে বেদম ধমক দিয়েছিল—'পাঁচটি তাই কি? আপনি খেদ্দ্যান, না পরতে দ্যান?'

'না, না, সে কথা নয়, আমি বলছিলাম কি—'

'বলি বাবুদের অত বলাবলির দরকারটা কি? আমি দুঃখ-ধান্দারি করি, বাছাদের খাওয়াই—ঘরে গিয়ে মা-ডাক শুনি। শরীল জুড়ায়।'

বৈশাম্পায়ন অপ্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল। বেচারা কালীতারা! স্বামী থেকেও নেই। নেহাত মা-ডাক শোনার জন্যই তাকে চালের কারবার করতে হয় না। রুগ্ন স্বামীকেও খাওয়াতে হয়। দিন কি আর চলে? তবু বুকে তার অনেক আশা। ছেলে বড় হবে, সঙ্গে সাথে ফিরে একদিন চাল কিনবে, চাল বেচবে। দুটো পয়সা হবে। দুঃখ ঘুচবে।

বৈশাম্পায়নের প্রশ্নে ফরিদা কিন্তু অবাক হয়ে গিয়েছিল। চাল বেচতে আসি ক্যানে? বলি, বেচবার মতো আমাদের আর আছে কি শুনি? চাল আছে বলেই না দুটো পয়সা পেচ্ছি। চাল যখন থাকবে না বেচবো না—তখন আমরা থাকব না, আপনারা থাকবেন না, গাড়িও থাকবে না।

ফরিদা কিছু মুখরা। এক কথায় সাত কথা শুনিয়ে দেয়। বয়স তার খুব বেশি নয়, খুব সুন্দরীও তাকে বলা যায় না। তবে দেহে যৌবন তার টসটস করে। যে কোন প্রকার পরিশ্রম, ঠেলাগুঁতো, দৌড়-ঝাঁপ সে গ্রাহ্যই করে না। যে কজন মুর্শিদাবাদী মেয়েছেলে দুর্ধর্ষ অভিযান চালিয়ে গাড়ি বদলের পরম্পরায় লালগোলা থেকে

কেশনগর, কেশনগর থেকে শান্তিপুর লোকালে চাল চালান করে। ফরিদা তাদের একরকম দল-পাণ্ডা। কেনাকাটা, গাড়িতে ওঠানো, কামরা-পাল্টানো, বিপদে কর্তব্য নির্ণয়—সবই ফরিদার কাজ। রওশন আলী তার ব্যবসায়িক জুড়িদার এবং প্রেমের পাত্রও বটে। কিন্তু নেতৃত্বের স্বাদ রওশন তেমন পায় না। তবু ফরিদাকে সে ছায়ার মতো অনুসরণ করে, তাকে 'রক্ষণাবেক্ষণ' করে—অথচ এখনও দুজনায় বিয়ে হয় নি। রওশন অবশ্য বিয়ের কথা ওঠাতেও খুব ভরসা পায় না।

রওশনও গায়ে-গোস্তে জোয়ান লোক। বয়স কিছু বেশি—প্রথম যৌবনে তার সুপুরুষ চেহারাই ছিল। কিন্তু দৌড়-ঝাঁপ, লুকোচুরি করলে, বেতাল খাটুনি খাটলে চেহারায় কি আর জৌলুষ থাকে। প্রেমিকের চেয়ে শ্রমিকের ছাপই তার মধ্যে এখন বেশি। তার উপর দুর্ভাগ্যের অন্ত নেই—পুলিসে সে মার্কামারা। গত রোববারের ঘটনাই বটে—ছুটির দিনে ধুতিপরা চপ্পল পায়ে রেল পুলিসের বড়বাবু রাণাঘাট স্টেশনে রওশন আলীকে দেখেই থমকে দাঁড়ালেন। মোটা লোক, গায়ে মাংস কিছু বেশি হলেও সারা দেহে যেন দুরমুজ করে পিটিয়ে দেওয়া। চোখ-ছোট মাথা-বড় ঘাড়-খাটো দারোগাবাবু যেন ছোট একটি গরিলা। ভদ্রলোক সব সময় এমন দৃষ্টিতে তাকান, যেন ইচ্ছা করলে যাকে-তাকে যখন-খুশি পিষে মারতে পারেন, কিন্তু মারেন না—কারণ দয়ার শরীর। সেদিন রওশনের প্রাণ তো উড়েই গিয়েছিল। একে তো ঘাটতি নদীয়ার নিষিদ্ধ এলাকার উপর দিয়ে চাল-পাচার করতে হয়। তার উপর রওশনের আবার একটি ব্যক্তিগত গোস্তাকি আছে—সে প্রেম-করা লোক। এবং তার দুর্ভাগ্য, কথাটি দারোগাবাবুর কানে উঠেছিল। রেল পুলিসের বড় দারোগার পক্ষে এতো কি সহ্য করা সম্ভব। নিজের বাঁপায়ের তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুলে রওশন আলীর হাঁটুর নিচে শক্ত চিমটি কেটে পরিহাস করতে করতে বড়বাবু বললেন—'প্রেমিক-চাঁদ না? পরের চাল, পরের ডাল, ন'দে করেন বিয়ে! বলি ইস্টিশানের উপর দিয়া এতো ঘোরাফেরাডা কিসের? ভ্যাক্‌চস্ নি হালায় লাঠি, পিটাইয়া সাইজ

বদলাইয়া হালবাম।' রওশন শেষ পর্যন্ত ছাড়া পেয়েই তফাতে সরে গিয়েছিল। তারপর এক ফাঁকে লালগোলায় উঠেই হাওয়া!

মেয়েগুলোর উপর দিয়েই কি আর মাঝে মাঝে কম ঝড় বয়ে যায়? অথচ কালকের মতো ঘটনা যখন অনিবার্য হয়ে ওঠে, তখন কি আর কলে কৌশলে আত্মরক্ষা, বিশেষ করে মাল রক্ষা না করে তাদের উপায় থাকে?

প্রথম ক্ষেপের ঘটনাই বটে। লালগোলা প্যাসেঞ্জার কাল তখন রাণাঘাটে সবে এসেছে। মাঝামাঝি এক জুতসই কামরায় সীতা, কমলা, সেলিমা, ফরিদা তাড়াতাড়ি উঠেই চালের বস্তায় চলাচল-পথ প্রায় জাম করে ফেলল। কামরার মধ্যে সে কি তখন দুঃসহ গাদাগাদি —চারজনের আসনে পাঁচ কি ছ'জন করে বসে আছে, দশজনের জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে কক্ষপক্ষে কুড়িজন। শীতের সকালেও লোকের গায়ে ঘাম দেখা দিয়েছে। রেলের কামরা তো নয়, ক্লিষ্ট মানবতায় প্যাক-করা ব্ল্যাক-হোল। তারই মধ্যে কোনমতে পথ করে জন পাঁচেক যুবক এগোতে লাগল—চালওয়ালী মেয়েগুলোর ব্যূহ ভেদ করে বস্তা হটানো ছাড়া আর কোন উদ্দেশ্যই যেন তাদের ছিল না। সরে যাও, নেমে যাও, বস্তা হটাও গোছের হুকুমদারি কিছু তারা করল বটে, কিন্তু কে তা শোনে; সরে যাবার, বস্তা হটাবার জায়গাই বা কোথায়? তবে আসল লক্ষ্য তো তাদের চালের বস্তা নয়, প্রমীলা-দল; বিশেষ করে ফরিদা। লাউডগা টসটসে ফরিদার মতো একটি মাত্র যুবতী পাঁচ-পাঁচটি যুবকের লক্ষ্যস্থল হলে অবস্থা বেসামাল না হয়ে যায়?

শৌচাগারের ঠিক সামনেই ফরিদা দঁড়িয়েছিল। পঞ্চ জোয়ান ঠেলতে ঠেলতে তখন অনেক এগিয়েছে; সর্বাগ্রবর্তী মস্তান তো একেবারে ফরিদার সামনেই এসে গিয়েছে। সুতরাং পূর্ব মতলব অনুসারে কারসাজি শুরু হতে দেরি হল না—ফরিদার বুকে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে শৌচাগারের দরজা বিপুল বেগে সে ঠেলতে লাগল। বাথরুমে যাওয়া যেন তার কতই দরকার!

অন্দর থেকে দরজা সামান্য ফাঁক করে রওশন আলী উঁকি দিল। বেচারা তখন ভয়ে কাঁপছে। ভেতরের অবস্থা বড় করুণ, এবং সদ্-যাত্রীদের শৌচকর্মের অযোগ্য, কারণ চালের বস্তার স্তূপ সেখানেও ছাদে গিয়ে ঠেকেছিল। মস্তানরা যে এ সব কিছু জানত, চালওয়ালীদের বুঝতে আর বাকি ছিল না। কিন্তু তাদের তো আর বলার উপায় ছিল না, বাথরুমে যাওয়া চলবে না! সমস্যা আরও ছিল—মস্তানগুলো যদি চেঁচিয়ে বলতে শুরু করে, 'নোংরা পায়খানার চাল নিয়ে তোমরা লোককে খাওয়াও!' অবস্থাটা বুঝে একরকম বাধ্য হয়েই ফরিদা, সীতা, কমলা, সেলিমা মস্তানদের কাছে গাদাগাদি হয়ে দাঁড়িয়ে বুক পেতে সব ঠেলা সামলে নিল! অবশ্য এ বিষয়ে পূর্বাহ্নেই আপন দলের মেয়েদের মধ্যে কিছু বোঝাপড়া আছে। গুণ্ডা বদমাস যদি এক আধটু উৎপাত করে, একটুখানি হাত বাড়ায়, কি আর তাতে এসে যায়!

সুখের বিষয় স্বামী ফোকটানন্দরা আজ আর শান্তিপুর লোকালে বিরক্ত করতে আসে নি। তবে চালওয়ালীদের কথা শুনে, তাদের সঙ্গে কথা বলে বৈশাম্পায়ন আজ আকাশপাতাল ভাবছিল। আর ঠিক তখন থ্রি থারটি ফোর ডাউন শান্তিপুর লোকালের চক্রতলে করুণসুরে একটি গানের সুর বাজছিল—আর কত দূর, আর কত দূর!

তিন

থ্রি হাণ্ড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুর লোকালে তিন ভিক্ষুক তখন বেদম গান গাইছে। রসের গান। আদিরস আর ভক্তিরসের। গানের মুগ্ধতায়, রসের মাদকতায় যাত্রীরা জগৎ সংসার প্রায় ভুলেই গেছে। এমন গান লোকাল গাড়িতে বড় একটা হয় না।

গান-গাওয়া ভিক্ষুকদলের প্রধান পুরুষ বৃদ্ধের কোঠায় পা দিয়েছে। তার দাড়ি ভরা গাল, মলিন বেশ, ক্ষীণ দেহ—তার উপর বেচারা আবার অন্ধ। কিন্তু একটি জিনিস কেউই লক্ষ্য না করে পারে না—দৈহিক এবং আর্থিক দৈন্য ছাপিয়েও তার মুখে যেন কি একটা আছে, যা দেখলে মায়া হয় বটে, তবে তার প্রতি সম্ভ্রমের ভাবও জাগে। বৃদ্ধ শান্ত এবং সম্ভ্রান্তই বটে। প্রাণ ঢেলে সে-বৃদ্ধই গাইছিল—

তুমি গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী
ও রূপ-যৌবন জোয়ারের পাণি।

গানে গানে রেল-কামরা আবিষ্ট হয়ে গেছে, সবার কানে কানে তখন একটি বিশেষ কথা বিশেষ করে বাজছে—'তুমি গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী'। অথচ গানের কোন আসর নয়, অনুষ্ঠান নয়—বিশেষ কোন বাদ্যযন্ত্রও তাদের ছিল না। বাঁশি, চেলো, হারমোনিয়ম তো দূরের কথা, নেহাত গ্রাম্য খোল করতাল বাজিয়ে আসলে তারা গাইছিল ভিখ-মাগা গান।

বৃদ্ধ গায়েনের প্রথম সঙ্গীর ভূমিকা মূলত খোল-বাদকের। নিষ্ঠার সঙ্গেই সে কর্তব্য পালন করছিল। দ্বিতীয় সঙ্গীর কাজের গুরুত্বও কিছু কম নয়, কিন্তু বেচার বাঁ-হাতে পঙ্গু। সেই অযোগ্য হাতে একপাটি করতাল কোন মতে রেখে ডান হাত দিয়ে নিপুণ করে সে টোকা দিচ্ছিল—খোল এবং করতাল বাজনার তালে তালে আবেশে আবেগে

কণ্ঠ মিলিয়ে তিনজনই গাইছিল—তুমি গোয়ালিনী রসের বিনোদিনী। যাত্রীদের কি ভালই না লাগছিল!

ঘুম থেকে উঠে চান খাওয়া সেরে তাজা মন, তেজী দেহ নিয়ে যারা দমদম কাশিপুরের কারখানায় যায়, কলকাতার আপিসে ছোটে, শীত তাদের কাবু করে না; দুর্জয় ভিড় তারা গ্রাহ্য করে না। নিত্য যাত্রা তো নয়, তাদের যেন নিত্য অভিযান। গান-গাওয়া ভিক্ষুকত্রয়ও ডেইলি প্যাসেঞ্জার, অন্য অনেকের মতো ভোর সকালে ওঠে, ছুটে গিয়ে গাড়ি ধরে কিন্তু ঘুমভাঙা ভোরে হয়তো কেউই তাদের সধূম চায়ের পেয়ালা এগিয়ে দেয় না। ঠাঁই করা আসনের কাছে ভাতের থালা, ঝোলের বাটি রেখে গরম ভাতে ঘি ঢালে না, পাখার হাওয়ায় ভাত জুড়িয়ে দেয় না। তাদের অভিযানও মার্টিন বাবুদের মতো রসঘন নয়। জীবনের ভার অমন হালকা করে তারা বইতে পারে না।

দেহে যতই অঙ্গবিকৃতি থাক, পোশাক যত দীনহীন হোক, ব্যক্তিত্ব যতই অবদমিত হোক, যাত্রীদের অযাচিত খেদমদ করে গান গেয়ে পয়সা ভিক্ষা নিয়ে তাদের ঘরে ফিরতে হয়। পেটে কম খেয়ে শূন্য ভাণ্ডারের কথা ভাবতে ভাবতে তারা লোকরঞ্জন করে, লোকরঞ্জন করতে করতে ভিক্ষা চায়,—যে যা দেয়, কপালে ঠেকিয়ে গ্রহণ করে। কিন্তু শান্তিপুর লোকালে ভিক্ষুক তো শুধু এই তিনজনই নয়, প্রতি মিনিটে প্রতি মুহূর্তে অসংখ্য ভিক্ষুক ভিক্ষুণী এসে এই কামরায় ঢুকে পড়ছিল, তারপর বিশেষ ধরনের এই তিন ভিক্ষুককে দেখে হিংসায় জ্বলে মরছিল। কারণ এদের মতো রসকলি আউড়িয়ে তারা গান করে না, নেহাত গতিক সুরে বলে—বাবু, দুটি পয়সা দিন।

গানের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে গায়কত্রয় গাইছে তো গাইছেই, হৃষ্টচিত্তে রসকলিতে সুর যোজনা করছে—

মামী যায় গাই দোয়াতে, ভাগ্না বালতি লইয়া যায়
গায়ের বাঁটে দুধ না পেয়ে ভাগ্না মামীরে দোয়ায়।

চলন্ত গাড়িতে যেন রসের ফোয়ারা খুলে গেল। [illegible] যেন শুধু মনে আনন্দ দেয় না, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে জাগিয়ে [illegible]
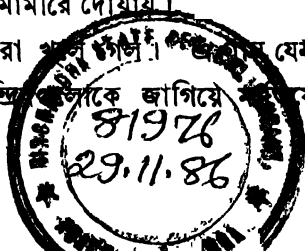
রাঙিয়ে দেয়, হৃদয়ের কূলে কূলে উপপ্লাবন ঘটায়। আজ অনেকেরই এই প্রথম মনে হল, ভিক্ষুকরা বড় ভাল লোক—তাদের গান ভাল, সুর ভাল, খোল করতালের বাজনা ভাল। এমন বাজনা জীবনে যেন তারা আর শোনেই নি! অনেকে নড়ে চড়ে বসে নিতান্ত অজ্ঞাতসারে একটি কাজ করে বসল—ভিক্ষুক-কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে গাইতে লাগল—মামী যান গাই দোয়াতে, ভাগ্না বালতি লইয়া যায়।

বৃদ্ধ গায়েন মনে মনে খুবই খুশি—মুখে তার তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে। ভিক্ষার গান হলেও সে বিশ্বাস করে, সে যা গাইছে আসলে তা তো শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, তা হোক না সে আদিরসে পাক-খাওয়া। একটু বিনীত গর্ববোধও সে করে। কামরাশুদ্ধ লোক যে তার গানে কণ্ঠ মিলায়, সে তার আপন কৃতিত্ব ছাড়া যেন কিছুই নয়।

উৎসাহের আতিশয্যে বেলেডাঙার ফটিক দত্ত বলল—'গোঁসাই, মামী-ভাগ্নার পুরো গানটি এবার হোক না ক্যানে।' ফটিক দত্ত অবশ্য পুরো গানটি আগেও শুনেছে এবং তাতে কৃষ্ণভক্তি তার কিছু বেড়েই গেছে। সুতরাং কৃষ্ণকথা যখন গাইছে, গায়ক তার কাছে গোঁসাই ছাড়া আর কি!

পুরো গানের সমর্থনে কামরাময় ধ্বনিত হচ্ছিল, 'হোক, গোঁসাই হোক, পুরো গানটি হোক।'—সুতরাং অবস্থা জমজমাট হতে কি আর দেরি হতে পারে? আপাত সঙ্কোচ অথবা শরমে যারা এতক্ষণ গানে যোগ দেয় নি, তারা এবার জোরে তাল ঠুকতে লাগল। অতি-উৎসাহী মার্টিনবাবুও বসে ছিল না। ভিক্ষুকত্রয় এবং সঙ্গীতমুখর যাত্রীদের সঙ্গে মিলেমিশে রস-গীতিকার শেষ কলিটি সে গাইছিল—

সাধের ভাগ্না রে, গুণের ভাগ্নারে
তুই ভাল তোর মামা ভাল নয়!

রেল কামরায় তখন গানে গানে সে কি তাল, তালে তালে সে কি নাচ! যাত্রীদের নাচতে দেখে বৃদ্ধের সহকারী দুজন তো খোলে চাটি দিতে এবং করতালে আঘতে করতেই ভুলে গিয়েছিল। তবে মার্টিনবাবুর জুড়ি কেউ ছিল না—নেচে গেয়ে রসমধুর নৃত্যগীতিমুখরতায়

আবিষ্ট হয়ে সে ঘন ঘন ধ্বনি দিতে লাগল : হরিবোল! কোথায় তখন ভক্তকণ্ঠ বৃদ্ধ—যেন সে নয়, মার্টিনবাবুই ভিক্ষুকদের দলপতি!

কে বলবে এই মার্টিনবাবু খেরেস্তান লোক, এবং কম করে তিন পুরুষের খৃষ্টান? কার্ডিগান-গায়ে বৌ, বেলবট-পরা মেয়েকে নিয়ে খৃসমাসের দিনে সে গীর্জায় যায়, একসঙ্গে প্রার্থনা করে, একই সুরে গায় 'ও কাম লেট আস এ্যাডোর দী'—ক্যারল গান। শুধু এই নয়, খৃসমাসের কটা দিনে তার মনপ্রাণ জুড়ে বিরাজ করে একটি বাইবেলী বাণী—'গড কমাণ্ডেথ হিজ লাভ টুয়ার্ড আস্' ইত্যাদি। কিন্তু তারপর? আবার যে সেই, চিরন্তন বাঙালী—কৃষ্ণকীর্তন শুরু হলে দিব্যি ভিড়ে যায়। মিলেমিশে যায়।

আজ সকালে চান খাওয়া সারতে সারতেই ট্রেন এসে গিয়েছিল। স্টেশনে এসে মার্টিনবাবু হাতের সামনে পেয়ে গিয়েছিল তুনম্বর বগীর দ্বিতীয় কামরা। অনেকদিনই কি জানি কেন এমন হয়; সকালিক চা খাওয়া পর্যন্ত ঘটে না। আজকাল অবশ্য চা খেতে আর তেমন ইচ্ছাও হয় না। তাই বোধ হয় তাকে বলতে শোনা যায়—সকাল বেলার চায়ের রস ভাতের স্বাদ মাটি করে দেয়!

ভাতের মুখে ছুটে এসে গাড়িতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনবাবুর রসিক মন নানাদিকে পরিব্যাপ্ত থাকে। অনেক ভিখিরির অনেক গান, অনেক মেয়ের অনেক প্রেম, অনেক ছেলের অনেক হাহাকার তার ভাল করেই জানা আছে। কিন্তু কেউ জানে না, কোন্ গানে তার কোন্-সে-ভাবের আবেশ ঘটে। অনেক দিনই মার্টিনবাবু কিন্তু অন্যের উপকারের জন্য এগিয়ে আসে, আজও লোকের সুবিধার্থে কত-কিছু উইথ-রেফারেন্স-টু-দি-কনটেক্স্ট্ বুঝিয়ে দেয়। আজ আর কিছু দরকার ছিল না। সাধের ভাগ্না কে, কে মামা, কে মামী তা বুঝতে কারও কষ্ট হয় নি। তাছাড়া মার্টিনবাবুর ভক্তি গদগদ হরিবোল ধ্বনি শুনে আজ সবাই ভাল করেই বুঝেছিল, গানের মত গান কি করে উপভোগ করতে হয়।

আদিরসসিঞ্চিত গানটি রাধা, কৃষ্ণ এবং আয়ান ঘোষকে নিয়ে

রচিত হলেও ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ গরুর বাঁটে দুধ না পেয়ে সত্যি মামীকে দুইতে গিয়েছিল কিনা, মহামতি বেদব্যাস তা কোথাও লিখেছেন কিনা, অথবা মামা আয়ান ঘোষের চাইতে ভাগ্নে শ্রীকৃষ্ণ কেন যে মামীর কাছে ভাল, তা নিয়ে আর কে মাথা ঘামায়? গানটিতে যেহেতু কৃষ্ণচরিত্রের আভাস আছে, সুতরাং ভক্তের কাছে তা আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ছাড়া কি।

বৈশাম্পায়ন বসে বসে এতক্ষণ কিন্তু একটি কথা ভাবছিল: বিনতা নন্দী না-জানি-কেমন করে গানটি গ্রহণ করেছে। বিনতার অলক্ষ্যে অজান্তে বৈশাম্পায়ন তার মুখখানা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সে যেন বিশেষ মুহূর্তে বিশেষ ভাবের ছাপ-মারা বিনতার মুখ নয়, অন্যের প্রেমপত্র—লুকিয়ে দেখতে ইচ্ছা করে।

বিনতার মুখেও গান-ভাল-লাগা তৃপ্তির ছাপ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল। হঠাৎ বৈশাম্পায়নের চোখে চোখ পড়তেই সে মাথা নত করল—যেন ধরা পড়ে গেছে।

গেয়ে নেচে হয়রাণ হয়ে মার্টিনবাবু চুপচাপ বসে পড়েছিল। এবার যথাযোগ্য বিনয়ের সঙ্গে সবার অভিনন্দন গ্রহণ করার পালা। অবশ্য ভিক্ষুকত্রয়কে এবং তাকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে কেউই কার্পণ্য করে নি। বৈশাম্পায়ন বটব্যালের বিচারে বৃদ্ধ গায়েন আর মার্টিন-বাবুর কৃতিত্ব সমান সমান দাঁড়াল। কিন্তু মার্টিনবাবুর নিজের মন তাতে সায় দিল না। পুরানো এম-বি ট্যাবলেটের কৌটো খুলে বিড়ি বের করে পেতলের সস্তা লাইটার জ্বেলে সে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। অনেকক্ষণ ধূমপান বন্ধ ছিল। এবার বিড়ি টানতে কি ভালই লাগল!

বৈশাম্পায়নের প্রশংসায় প্রশ্রয় পেয়ে বৃদ্ধ দলপতি এগিয়ে এসে বলল—'বাবু, আমাদের একটু চা খাওয়াবেন না?' চা না খাইয়ে বাবু কিন্তু দু'টাকা বখশিশ করল। অন্য সঙ্গীরা কোথায় আছে হাত বাড়িয়ে টাকা নিতে বৃদ্ধ তা দেখতে পারল না বটে, কিন্তু সর্ব ইন্দ্রিয়ানুভূতিতে ঠিক ঠাহর করে নিল। তারপর বৈশাম্পায়নের

চোখের সামনে অত্যন্ত সন্তর্পণে টাকা ফতুয়ার পকেটে পুরে দিল। সঙ্গী-সাথীরা জানতেও পারল না!

বৈশাম্পায়নকে নগদ দুই টাকা দিতে দেখে একজন মহিলা ডি-পি ভাবলেন, দান করার যোগ্যতা যে তার কম নয় সেটি প্রমাণ করা দরকার। সুযোগ পেতেও তার দেরি হল না—এক ভিক্ষুণী এসে মা ডেকে ভিক্ষে চাইতেই অম্লান বদনে মহিলা দু টাকার একখানা নোট তার হাতে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই তার মনে আফসোসের আর অন্ত রইল না; নিজের মনেই তিনি বললেন—'আট আনা পয়সা দিলেই ভাল হত।' চিন্তার গতি দ্রুত হতেই আবার তিনি ভাবলেন—ধ্যেৎ, দশটি পয়সা দিলেই ভিক্ষুণী খুশি হয়ে যেতো—লোকে তো দু পয়সার বেশি দেয়ই না। নির্বুদ্ধিতার জন্য নিজের উপর তার একটু রাগও হল। কিন্তু পরক্ষণেই তার মন আবার বলল—হাজার হলেও তো ভিক্ষুক—দুটাকায় তার অনেক কাজ হবে!

বিনতা নন্দী হঠাৎ বৈশাম্পায়নকে একটি প্রশ্ন করল—'ভদ্রমহিলার বড়ই দয়া, কি বলেন বিশপবাবু?' বিনতার কথায় ভদ্রমহিলার প্রতি একটু শ্লেষ প্রকাশ পেল। তার দান যে স্বতস্ফূর্ত নয়, নেহাত দান-করতে-দেখে দান করা, অন্য অনেকের মতো বিনতারও তা ভাল লাগে নি।

বৈশাম্পায়ন কিন্তু বিনতার বক্র বক্তব্যের ধার কাছ দিয়ে গেল না। অবাক হয়ে সে বলল—'বিশপবাবু! আজ হঠাৎ 'বিশপ-বাবুটি'কে কোত্থেকে আমদানি করলেন?'

মিষ্টি হেসে বিনতা জবাব দিল—'আপনার অত বড় নাম—ছাঁটলে বড় জোর বিশু হয়, কিন্তু মহিমায় ঘাটতি পড়ে। বিকল্প একটা কিছু তো চাই।'

বৈশাম্পায়ন প্রতিবাদ করল—'কিন্তু বিশপ হলে যে ধর্ম থাকে না।'

বিনতার জবাব তৈরীই ছিল—'ব্যাপার কি জানেন, আপনার যা চেহারা-খাপ-খাওয়া দাড়ির বাহার, তাতে বিশপ নামটি মানায় ভাল—নামের শুচিতাও বজায় থাকে।'

আশ্চর্য, যুক্তিটি বৈশাম্পায়নের পছন্দই হল। নামটিও। অব্যক্ত খুশির আবেগে মন তার ভরে উঠল। এ যেন শুধুই একটি নাম নয়, একটি পরিণাম—হঠাৎ পথে কুড়িয়ে-পাওয়া মুক্তোর মালা!

দুলকি তালে চলতি গাড়িতে বসে নামদাত্রী বিনতা নন্দী মিষ্টি হাসি হেসে বিশপবাবুকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। সে-হাসি চিনতে নবাভিষিক্ত বিশপের ভুল হল না।

চার

চাকদা স্টেশনে কোলাহলের অন্ত ছিল না। কানাই পাল গাড়িতে উঠেই আবিষ্কার করেছিল, পাশ আর পার্স আনা হয় নি। লাফ দিয়ে সে নেমে গেল এবং তার ধাক্কার আঘাত সামলাতে না পেরে এক মহিলা একেবারে কুপোকাৎ। বেচারার কোলে ছেলে, পেটে ছেলে, হাতে বোচকা ছিল। মা এবং ছেলের কান্না আর থামে না। ছেলের কান্না আঘাতের, মায়ের কান্না আঘাত এবং ভয়ের—গাড়িতে যদি আর না উঠতে পারে, গাড়ি যদি ফেল হয়!

সবজী আর ফলের ঝুড়ির ঘায়ে জনছয়েক লোক জখম হয়েছিল। কিন্তু ঝুড়িওয়ালাদের ভ্রুক্ষেপ নেই—কারণ গাড়িতে মাল ওঠাতেই হবে—মাল না উঠলে কলকাতার লোকের কষ্ট হবে এবং সে-কষ্ট পাথরের ভার যেন একমাত্র চাকদার ব্যাপারীদের!

প্ল্যাটফরমের মাঝের দিকে খাটিয়া-শায়িনী এক ভদ্রমহিলা মরার মতো পড়ে ছিল—নিম্নাঙ্গ তার পক্ষাঘাতে পঙ্গু। নিদারুণ ভিড় দেখে বেচারা কেঁদেই খুন—খাটিয়া সহ তাকে যদি গাড়িতে না ওঠানো যায়।

ভিড়, ঠেলাঠেলি, যাত্রীনামা, মাল ওঠা—কত হরেক রকম ব্যাপার। ঘটনা আর দুর্ঘটনার অন্ত নেই। ব্যাপার-স্যাপার দেখে হারুদা বলেছিলেন—'ভাগ্যিস আমাদের শান্তিপুরে বাড়ি; একেবারে গোড়া থেকে উঠে নির্বিঘ্নে বসতে পারা যায়।' ভারি সত্যি কথা, সুতরাং কারও দ্বিমত হওয়ার কারণ ঘটে নি। কিন্তু তখনই ব্যাপারটি ঘটে গিয়েছিল—রীতিমতো সোরগোল তুলে জনকয়েক যুবক গাড়িতে উঠে নিজেদের শুভাগমনের সংবাদ জানাতে জানাতে বলেছিল—'হারুদা, আমরা উঠেছি, আমরা এসেছি। আমরা এসে গিয়েছি হারুদা!'

যুবকদের আগমন-সংবাদ হারুদার কাছে কতটা মধুর বলা যায় না,

তবে 'হারুদা' শব্দটিতে তারা একটি কসরতি কায়দা যোগ করেছিল—উচ্চগ্রামে উঠিয়ে একেবারে আলতো করে ছেড়ে দিয়েছিল। হারুদা তখন রোজকার মতো কোণের সিটে শান্তিপুরের দিকে মুখ করে বসে পান-মুখে যাবর কাটছিলেন।

যুবকগুলোর তখনও অনিশ্চিত অবস্থা। সিট রাখা আছে কি নেই, বসতে পারবে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকবে, কেউ জানে না। যারা এরই মধ্যে হারুদাকে ভাল করে একনজর দেখেছিল, তারা আবার বলল—'হারুদা, আমরা এসে গেছি।' যারা তখনও তাকে দেখতে পায়নি, তারাও পাঁঠার মতো কাঁপা কাঁপা গলায় নিজেদের শুভাগমনের কথা ঘোষণা করল। হারুদা কিন্তু নির্বিকার—চোখ তুলে একবারটি তাদের চেয়েও দেখলেন না। তুজন নবাগত যুবক রড ধরে কোনমতে দাঁড়িয়ে পড়েছিল—একজন আবার হারুদার ঠিক মুখোমুখি। সংরক্ষিত আসনের খোঁজ পেয়েই রুমাল দিয়ে ঝাড়তে ঝাড়তে তারা একই সঙ্গে এবার বলল—'হারুদা, তবে এসেছেন? সুপ্রভাত, সুপ্রভাত!'

আচমকা-ঘুম-ভাঙা-মতো লাল চোখে হারুদা তাদের একটু চেয়ে দেখলেন। তার মনের ভেতর ক্রোধের অন্ত ছিল না। তেমন শক্তি থাকলে এই মুহূর্তে সবাইকে যেন ভস্ম করে ফেলতেন। তার দিকে তাকিয়ে রতন খাসনবিশ বলল—'আমি তো ভাইবা রাখছিলাম হারুদা আজ আইবেন না।'

রসরাজ দে তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করল—'হারুদা সম্বন্ধে তোমার এমনটি ভাবা উচিত হয় নি রতোন। এতে করে হারুদার কর্তব্যনিষ্ঠার প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে।' সবাই এক সঙ্গে হেসে উঠল।

সদানন্দ বাউরী একটি বেখাপ প্রশ্ন করে ফেলেছিল—'বৌদি ভাল আছেন হারুদা?' 'কেমন আছেন, কেমন আছেন' বলে বাকি সবাই চেঁচিয়ে উঠেছিল।

গতকালই হারুদার সঙ্গে সবার দেখা হয়েছিল, এই একই গাড়ির একই কামরায়। এরা এমন কোন ভাই-লক্ষ্মণ নয়, যে এক রাত্রির অদর্শনে হারুদা কাতর ছিলেন, আর তাই গাড়িতে উঠতে-না-উঠতেই

চেঁচিয়ে জানাতে হবে—আমরা এসেছি।' তাছাড়া তার অন্তঃপুর-চারিনীকেও এরা কখনও চোখে ছ্যাখেনি—আজ-ছেঁচকি-করেছিল, রোববার-মাংস-রেঁধেছিল ধরনের টুকরো কথায় বৌদি-কথিত জনৈকা মহিলার অস্তিত্ব সামান্য টের পেয়েছিল মাত্র। তাই বলে ছোঁড়াগুলো হঠাৎ তার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করবে তেমন কোন সঙ্গত বা প্রশ্রয়পূর্ব কারণ তো কিছু নেই। সুতরাং হারাণচন্দ্র বঙ্গ মশাই এবার একটু মুখ খুললেন—'চ্যাংড়ামো কিছু কম করবে, বুঝলে?'

বিলক্ষণ বোকার ভাণ করে রসরাজ বলল—'আহা, গোঁসা করছেন কেন হারুদা?' হাতের খোলা প্যাকেট থেকে ত্রস্তে একটি সিগারেট বের করে রসরাজ এবার এগিয়ে ধরল এবং ধরিয়ে দেবার ভঙ্গিতে বাঁ হাতে লাইটারটিও রাখল।

হারুদার পক্ষে লোভনীয় একটি পরিস্থিতি। সিগারেটের দিকে একবার মমতার দৃষ্টি নিয়ে দেখেই হারুদা আত্মসংবরণ করলেন—'নাহ্, নেওয়া ঠিক হবে না। সামান্য একটা সিগারেটের সূত্রে হয়তো পরে দুকথা শুনিয়ে দেবে। যতো সব ডেপো কোথাকার। হারুদা এবার কিন্তু খুব সংক্ষেপে, কিন্তু বিস্তর তেজের সঙ্গে বললেন—'না, সিগারেট চাই না।' এই অসামান্য সংযমের পরিচয় দিয়ে মনে তার আত্মপ্রসাদের অন্ত রইল না। নিজের উপর শ্রদ্ধাটা কিছু বেড়েই গেল।

রতন খাসনবিস কিছু ক্ষুণ্ণ হবার ভাণ করে বলল—'চটেন ক্যান্ হারুদা, আমরা হালায় চাকদার পোলা—রাগমাগের দ্বার দ্বারি না। রসরাজ দিছে যহন, বইয়া বইয়া ধুমা ছাড়েন। সময় কাইটবো।'

রতন খাসনবিসেব কথায় হারুদার পক্ষে সিগারেটের লোভটি কিছু দুর্নিবার হবার লক্ষণ দেখা দিল। রতন ছেলেটা আসলে সাদাসিধে—মন আর মুখ তার এক। দোষের মধ্যে বাঙাল, এই যা! অবশ্য রতনই একান্তভাবে বিড়ি-সেবী হারুদাকে মাঝেমধ্যে সিগারেট খাওয়ায়, হাতের মধ্যে প্যাকেট গুঁজে দিয়ে বলে—'আপনে নিজে আ-তে বাইর কইরা লন।' তারপর রতন ইচ্ছা করেই প্যাকেটটি ফেরত নিতে অন্তত কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যায়। হারুদা দেখিয়ে একটা, না-দেখিয়ে

আরেকটা সিগারেট তুলে সন্তর্পণে বুক পকেটে রেখে দেয়। এ সিগারেটের স্বাদই তার কাছে আলাদা, পরের পয়সায় ট্যাক্সি-চড়ার মতো। রতন এসব জানে, জেনেও কিছু বলে না—কারণ একটার বেশি সিগারেট চুরি করার মতো হিম্মত হারুদার নেই।

সিগারেট নিতে দেরি করতে দেখে রসরাজ হঠাৎ বলে উঠল—'ঠিক আছে হারুদা, সিগারেট নিয়ে এক খিলি পান ছাড়ুন দিকিনি।'

রসরাজ নড়েচড়ে বসল। রতন আর সদানন্দও পান চাইতে দ্বিধা করল না। এদিকে তাস খেলার আসর থেকে পর পর ভেসে এলো তিনটি শব্দ—"চারটে চিড়ে", তারপরই আবার "ডাব্‌ল"। শুধু "ডাব্‌ল" কথাটা কানে আসতেই হারুদা রেগে গিয়েছিলেন—'কী, তোমরা ডবল-খিলি পান চাইতে এসেছ?'

তাসের আড্ডা খুব যে দূরে ছিল তা নয়। তবে তারা খেলুড়ে বটে, একেবারে নিখাদ তাস-প্রেমিক—বসবার জায়গা না পেয়ে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই দিব্যি খেলছিল, ডবল দেবার সুযোগ হলে বিপুল প্রত্যয়ের সুরে বলছিল—ডাব্‌ল! চলন্ত গাড়িতে যাত্রীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যখন তাস খেলে, হারুদা নিজের আসনে বসে বসেই তা দেখেন, দেখে বেশ মজা পান। এ যেন এক দুর্লভ দৃশ্য। কিন্তু আজ তার মনমেজাজ খুব ভাল ছিল না। একে তো ভিড় এখন মাত্রা-ছাড়া, তার উপর চাকদার ছেলেগুলো বড়ই জ্বালাচ্ছিল। সুতরাং ডাব্‌ল যে ডবল-খিলি পানের দাবি, তাতে আর সন্দেহ কি!

পান দেবার সমস্ত ইচ্ছা হারুদার উবে গিয়েছিল। কারণ আছে। হারুদার স্ত্রী পানগুলো রোজ নিজ হাতে সেজে দেন। এজন্য যত্নই কি আর তাকে কিছু কম করতে হয়? প্রথমে পরিষ্কার করে ধুয়ে পানগুলো দুফালা করে চিড়ে নেন। ডগা ছিঁড়ে ফেলেন। ডগা ছিঁড়ে পান সাজতে হারুদার আবার কড়া নির্দেশ। ভুল হলে চলবে না। ডগা ছিঁড়ে চুণ খয়ের সুপুরী-কুচি দিয়ে ভদ্রমহিলা খিলি করেন, তারপর যত্ন করে খিলিগুলো ডিবাতে ভরে দেন। রোজ দেড় ডজন খিলি। সারাদিন হারুদা পানগুলো যমের মতো আগলে রাখেন, কৃপণের মতো

খান। এমন জিনিস কি অপরকে দিতে আছে, বিশেষ করে বৌ যা একান্তভাবে তারই জন্য আপন হাতে খিলি করে দেয়? ছোঁড়াগুলো ভেবেছেটা কি? আমার বৌয়ের সেবাযত্নে ভাগ বসাবার ইচ্ছা? সাহস বটে। চটে গিয়ে হারুদা বললেন—'তা হলে সিগারেটের বিনিময়ে বাবুদের পান চাওয়া হচ্ছে? কতদূর নেবে গ্যাছো একবার ভাবো দিকিনি।' প্রৌঢ় পুরুষ হারাণ বঙ্গ হাইপাওয়ার-চশমার মোটা কাচের মধ্য দিয়ে সবার দিকে তাকালেন। মনে হল, চোখ দুটো কেমন যেন বড় বড়, একেবারে ডবল সাইজের।

হারুদার পান-অভ্যাসের পশ্চাতে একটি ইতিহাস আছে। প্রথম প্রথম চারটে কি পাঁচটা পান তিনি প্রতিদিন খেতেন। তিনবেলা খাবার পর তিনটে, চায়ের পর একটা। এক কাপ বাড়তি চা হলে আরও এক খিলি পান খেতে তার ইচ্ছা হত। বৌ বলতেন—'তোমার এতোগুলো পান সেজে দেবেটা কে শুনি?

'কেন, তুমি দেবে' হারুদা হেসে জবাব দিতেন।

স্ত্রী রাণীবালা দেবী আবার বলতেন—'কিন্তু পয়সাটাই কি কম খরচা হয়? সুপুরীর যা দাম! আর পানেরই কিছু কম দাম? তা আবার বাবুর আধখানায় সাজা খিলিতে চলবে না। গোটা গোটা পান চাই। গোনা মাইনের সংসারে এমন পান-দোষ থাকলে চলে?' খোঁটার অন্ত নেই।

বছর খানেকের মধ্যে হারাণ বঙ্গর বেতন দশ টাকা বৃদ্ধি হল। চল্লিশ টাকার একটি টিউশনিও তিনি ধরলেন। পানের খরচ আরও বেড়ে গেল। কারণ পানের সঙ্গে তখন জর্দা যোগ হয়েছে। মধুগন্ধ মজিদ জর্দা। আপিসের অদূর রাস্তায় তখন একটি মেয়ে বসে পান বেচত। যুবতী মেয়ে। ধারকাছে তার দারুণ ভিড়। সেই পানওয়ালীই হারুদাকে হরেকরকম জর্দা-মাহাত্ম্য শিখিয়েছিল—জর্দাগন্ধ-মাহাত্ম্য। মিঠে-কড়া রস-ঝরা উত্তেজক গন্ধ। পান খেয়ে হারুদা তার সঙ্গে গুড় গুড় করে কথা বলতেন। লোকে আকাশ-পাতাল ভাবত।

শেষ পর্যন্ত পাঁচ টাকায় ছোট এক কৌটো জর্দা কিনে হারাণ বঙ্গ

একদিন বাড়ি ফিরলেন। বঙ্গ-গিন্নী রেগে আগুন। হারুদা বললেন —'চটছ কেন গিন্নী—বাড়তি পঞ্চাশ টাকা তো এই মাস থেকেই আসছে।'

কিন্তু গিন্নীর কি আর রাগ পড়ে? বাড়তি টাকা যে আসবে তা যেন জানা কথা। মুখ ঝামটা দিয়ে তিনি বললেন—'টাকা বেড়েছে? কিন্তু খরচও কি আর বেড়ে চলছে না?' টাকা অকুলান হবে বলে ভদ্রমহিলার সব সময় বড় ভয়। নিজের ক্রমশ-স্ফীত উদরের কথা তার ঘন ঘন মনে পড়ে। তখন দ্বিতীয় সন্তান আসছে।

কিন্তু পান খাওয়া নিয়ে কি শেষ পর্যন্ত সংসারের শান্তি নষ্ট হবে? হারুদা একটি নতুন পথ ধরেছিলেন। রাজনীতির পথ। বৌকে তিনি পান খাওয়া শিখিয়েছিলেন। শুরু থেকেই জর্দা পান।

সিনেমা-ফেরৎ রাণীবালা দেবীকে নিয়ে হারুদা একদিন কালীঘাটে জর্দা-দোকানের সামনে দাঁড়ালেন। চারদিকে মনোবিমোহন জর্দা-গন্ধ ভুর ভুর করছে। রাণীবালা নাক ছোঁক ছোঁক করে গন্ধ নিলেন। ভারি ভাল লাগল তার। আরও একদিন হাজরার মোড়ে একই ঘটনা ঘটাল। তৃতীয় দিন ধর্মতলায়। রাণীবালা বঙ্গ জর্দার গন্ধে কেবলই উন্মনা হন। শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা স্বামীকে একদিন বলেই ফেললেন—'সত্যি এসব শুধু-জর্দার গন্ধ?'

'তবে!' বিজয়ীর মতো হারুদা বললেন—'খেয়েই দ্যাখো না এক খিলি, এই এতোটুকুন জর্দা দিয়ে।' আঙুলের ডগায় হারুদা জর্দার পরিমাণ দেখালেন।

'মাথা ঘুরবে না?' ইতস্তত করে বঙ্গ-বধূ শুধালেন।

'পাগল! ঐটুকু জর্দায় মাথা ঘোরে? বলি ওহে ভোলানাথ, তোমার বৌদিকে একখিলি জর্দা-পান দাও দিকি নি।'

এসব অনেক দিনের কথা। হারাণ বঙ্গ মশাই তখন স্ত্রীকে নিয়ে কলকাতায় থাকতেন। কিন্তু রাণীবালা দেবী সেই যে জর্দা পান ধরেছিলেন, আজও তা হাতের নোয়ার মতো বজায় আছে। পান থেকে হারুদা এখন জর্দা-ছাঁটাই করেছেন, কিন্তু খিলির সংখ্যা-

বৃদ্ধি ঘটেছে। এখন শিঙ্গ্‌ল-খিলিই চলছে—একটি পানে দুটো খিলি।

হারুদার প্রথম চাকুরি জীবনে আরও কত সমস্যা ছিল। রোববারের ছুটির দিনেও কাজে যেতে হত। অথচ তার জন্য বাড়তি পয়সা তো মিলতই না, উপরন্তু গাঁট থেকে বাস ভাড়া গচ্চা যেতো। রাণীবালা বলতেন—আমায় বোকা পেয়েছ? তোমার মালিক ছুটির দিনে খাটিয়ে নিচ্ছে, কিন্তু পয়সা দিচ্ছে না--তা কখনও হয়? নিশ্চয় সে-পয়সা কোথাও বে-হক উড়িয়ে দিচ্ছ। অথচ আমাদের কিনা একরকম টানাটানির সংসার!

হারুদা হাসতেন। কিই বা করা যায়? কিন্তু তার তখন মনে হত, মেয়েছেলে বড় অদ্ভুত জাত। ~~স্বামীকে ভাবেটা কি?~~ কেনা গোলাম? তাকে কাজের হিসাব, গতিবিধির হিসাব, টাকাপয়সার হিসাব দিতে হবে। দেহমন দিতে হবে। সমস্ত রকম সন্দেহ আর বাক্যবান হজম করতে হবে। অথচ নিজের বেলায় সাতখুন মাপ। দুপুর বেলায় তিনি যদি হঠাৎ ম্যাটিনি দেখতে যান, আর বাড়ি ফিরে আমি যদি ঘরে তালা ঝুলতে দেখি, তবু রাগ করলে চলবে না। মাছের ঝোল স্বাদ না হলেও বলতে হবে, অমৃত। তার-কেনা ধুতি পছন্দ না হলেও ঘোষণা করতে হবে, এমন সুন্দর ধুতি নিজে বেছে কখনও কিনতেই পারি নি। সব ব্যাপারেই তার গানের, তার গুণের, তার কাজের স্তুতি বন্দনা করতে হবে। এর নাম নাকি এ্যাডজাস্টমেণ্ট।

কিন্তু হারুদা সেয়ানা লোক। বিয়ের পর রাণীবালাকে আদর করে বলতেন বৌ, তারপর গর্বমিশ্রিত ঢঙে ওয়াইফ—এখন অবশ্য স্ত্রীও বলেন, বৌ বলেও উল্লেখ করেন। দিব্যি হারুদা খাপ খাইয়ে নিয়েছেন। এখন দুজনায় বেশ চলছে। শুধু এই বয়সে কিনা ডেইলি প্যাসেঞ্জারগুলো বড্ড বিরক্ত করে।

পান-চাওয়া রসরাজদের উপর হারুদা সেদিন সত্যি সত্যি রেগে গিয়েছিলেন। মজার কথা, রাগলেও কিন্তু হারুদাকে ঠিক রাগী

মানুষের মতো দেখায় না—মনে হয়, হাসতে গিয়ে হঠাৎ হাসিটি সারা মুখে স্তব্ধ হয়ে গেছে, আর তার উপরকার লঘু স্তর উবে গিয়ে কেমন একটা ঈষৎ থমথমে ভাব সৃষ্টি করেছে, জ্বাল-দেওয়া কড়ায় খুব পাতলা সর-পড়া দুধের মতো।

হারুদার পরিষ্কার কামানো গাল ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের কেউ দেখেছে কিনা সন্দেহ—কারণ দাড়ির অভাব তার গালে কখনও নেই। ওদিকে দাঁতের অবস্থাও তেমন সুবিধার নয়। উপর পাটিতে দুটো দাঁত নেই, বাকি দাঁতগুলো সাইজে বড় এবং রঙ বিদঘুটে কালো—যেন সৃষ্টিকর্তা শ্যাওলাপড়া ঝামা কেটে অত্যন্ত অযত্নে তৈরী করে দাঁতগুলো নেহাত অসমান অবস্থায় তার মুখে বসিয়ে দিয়েছিলেন। মুখ খুললেই পান-খাওয়া লাল মুখ-গহ্বরে কালো দাঁতগুলো এখন বিশ্রী দেখায়।

হারুদার রাগের কথা বুঝতে পেরে রসরাজরা সাময়িকভাবে পান-প্রসঙ্গ চাপা দিল বটে, কিন্তু খাওয়ার প্রসঙ্গ তুলতেও দেরি করল না। রতন খাসনবিস কিছু পেটুক লোক। জমজমাট খাওয়ার গল্প শুনতে আবার তার ভারি ভাল লাগে। পরম তৃপ্তিতে হারুদাকে পান চিবুতে দেখে রতন বলল—শীত চইলা যাওয়ার তো আর দেরি নাই, পিঠা-ফিটা খুব খাইয়া লইচেন তো হারুদা!

হারুদা অখুশি হলেন না; মুখে একটা পান পুরে দিয়ে তাড়াতাড়ি জবাব দিলেন—'আমার স্ত্রী গেল-হপ্তায় বেড়ে পিঠে করেছিল মাইরি। বেশ সুন্দর পুলি পিঠে। মুগের পুলি। কিন্তু আমার স্ত্রী কি ভালবাসে জান? পাটিসাপটা। কাল পাটিসাপটা করেছিল। গরম গরম ভেজে দিল। ছ'খানা খেয়ে ফেললুম মাইরি। হারাণ বঙ্গ মশাই একটি তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিলেন, তারপর যেন একটি বিশেষ কথা মনে পড়েছে তেমন করে বললেন—'জানলে, আমার স্ত্রী আমায় খুব যত্ন করে খাওয়ায়।

শুধু আমার স্ত্রী, আমার স্ত্রী—যেন অন্যের স্ত্রী নেই, আর থাকলেও তারা পরের সোয়ামীকে যত্ন করে খাওয়ায়। এবার সদানন্দ

বাউরী মুখ খুলল—'হুহ্, যত্ন করে ভারি তো খাইয়েছে—মাত্তর হু'খানা পাটিসাপটা, তাও আবার চায়ের সঙ্গে। পিঠে পায়েস আবার চায়ের সঙ্গে কেউ খায় নাকি? খেতে বসেছ তো ওড়াও দু'ডজন পাটি জোড়া, ডজন খানেক মুগের পুলি, খাজা ক্ষীর আর খেজুর গুড় দিয়ে ডজন-ডজন চিতুই পিঠে। সব শেষে পাটি জোড়ার পায়েস, যার নাম আসল পাটিসাপটা। তবে তো পিঠে খাওয়া!'

রতন খাসনবিশ কিন্তু খুব ভদ্র শান্ত ভাবে হারুদাকে একটি কথা জিজ্ঞেস করল—'আপনারা তো নিমকি সিঙারা দিয়া চা খান। পাটি-সাপটা দিয়া চা খাইতে গ্যালেন ক্যান্?'

হারুদা প্রথমে তুমি-কি-তার-মর্ম-বুঝবে হাসি হাসলেন, তারপর তৃপ্তির সুরে বললেন—'আমার স্ত্রী যত্ন করে ভেজে দিলে যে, না খেয়ে পারি? তেনার অবিশ্যি বাইরের খাবারের টানটাই বেশি—বিশেষ করে সিঙারা, নিমকি, গজা।' হারুদা একটি ঢোক গিললেন, তারপর ভাবতে লাগলেন, কবে দু'জনায় একসঙ্গে বসে সিঙারা-নিমকি-চা খেয়েছেন।

কথার খেই হারিয়ে যায় দেখে হারুদা আবার বললেন—'তোমরা বাঙালরা তো শুনতে পাই দোকানের খাবার কিনে পয়সা খরচা কর না।'

কিন্তু কথাটা বলে হারুদার নিজের কাছেই বোধ হয় কিছু অস্বস্তি বোধ হয়ে থাকবে। সেটি কাটাবার জন্য পরক্ষণেই বললেন—'তবে হ্যাঁ, বাঙালরা অতিথিদের খেতে দেয় বটে—জামবাটি ভরা ঘন জ্বালের দুধ, চিড়ের মোয়া, চন্দ্রপুলী, ক্ষীরের তক্তি। জল খাবার খেয়েই হেউ ঢেউ। এর পর আবার চা-ফা কেউ খায়, না কারও খেতে ইচ্ছা করে?'

'বাঙাল বাড়িতে আপনে কখন খাইচেন?' রতন এবার প্রশ্ন করল।

'অই ত্যাখো'—বিশ্বাস উৎপাদনের সুরে হারুদা বললেন—'এই তো সেদিন আমার শ্যালক ফিরতি-পথে চাকদায় নেমে মহাদেব পালের

বাড়িতে ভোজ খেয়ে এলো।—জল-খাবারের পরই কি মহাদেবের মা আর ছাড়ে? রাতের মতো একবারে পুরো ভোজ খাইয়ে দিল; গরম গরম ভাত—গাওয়া ঘি, বেগুন ভাজা, মাছের ঝোল, তার সঙ্গে রুই মাছের আস্ত একটি মুড়ো। ঘিলু ভর্তি।'

বঙ্গ মশাই কথাগুলো এমন করে বললেন, যেন তার শ্যালক নয়, তিনি নিজে মহাদেব পালের বাড়িতে এমন ভোজই খেয়ে এসেছেন; আর বাঙালদের সব বাড়িতেই রোজ ক্ষীর-তকতি ঘনদুধ চন্দ্রপুলীর জলযোগ এবং সবশেষে ঘিলুভরা রুইমুড়োর ভুরিভোজ হয়!

পানের কথাটি কেউ কিন্তু তখনও ভোলে নি। হারুদাকে কিছু বেকায়দায় ফেলার মতলবে সদানন্দ বাউরী বলল—'এক খিলি পান এবার ছাড়ুন তো হারুদা।'

হারুদা নির্বিকারভাবে বললেন—'না।'

'দিন না মশাই, একটা বইতো নয়'—আবদারটিকে সদানন্দ এবার আরও জোরদার করল।

'কোথায় একটা, তোমরা তিনজন আছো না?' চোর-বাছাই করা দৃষ্টিতে তিনজনকে একবার দেখে হারুদা তিরস্কার করলেন—'তোমরা শালা পরগাছা, সবাই চেয়েচিন্তে খাও—সিগারেট দেবার নাম করে পান চাও।'

'আরে হারুদা, যে খায় চিনি যোগায় চিন্তামনি'—রসরাজ শুধু বললই না, মনে হল, যেন একটি মজার কবিতা আবৃত্তি করছে। এবং সেটি সে নিজে লিখেছে, সকালে ঘুম থেকে উঠেই। অবশ্য রসরাজ এবার এলো আসল কথায়—'তিন হপ্তা না কাটতেই পকেট গড়ের মাঠ হয়ে যায় হারুদা। শুরু হয় ধার ধারেকা। ভাগ্যিস লক্ষ্মণ পাঁড়ে ছিল। কিন্তু শালা শায়লক-দি-যু, দশ টাকায় মাসে এক টাকা সুদ নেয়। অথচ হাত-পাতা ছাড়া আমাদের কি গতিই বা আছে? এবার বলুন তো হারুদা, এমন অবস্থায় পানটা বিড়িটা চেয়েচিন্তে খেলে মহাভারত কিছু অশুদ্ধ হয়?'

হারুদা বিষণ্ন চোখে রসরাজকে দেখতে লাগলেন। দিন পনেরো

আগের কথাই হবে। পান-চাওয়ার যোগ্যতা প্রমাণের জন্য এই রসরাজই বলেছিল—'মেয়ে বায়না ধরল, ফুলহাতা সোয়েটার চাই। বলি একটা তো আছে, আরেকটা কিনে কি হবে? কে কার কথা শোনে? আশ্চর্যের ব্যাপার, মেয়ের মা কিনা যোগ দিয়েছিল মেয়ের পক্ষে!'

হারুদা অবাক হয়ে বলেছিলেন—'সে কি কথা!'

রসরাজ আপন খেয়ালে বলে যাচ্ছিল—'ঠিক বলছি হারুদা, মেয়ে-জাতটার উপরই ঘেন্না ধরে গেছে। নিজের স্ত্রী হয়ে কিনা সোয়ামীর সুখ সুবিধা বোঝে না। পাঁড়েজী না থাকলে সেদিন মান তো মান, প্রাণরক্ষাই হত কিনা কে জানে।' বলতে বলতে রসরাজ ঢিপ-ঢিপ করা বুকে হাত রেখেছিল, যেন ঐখানে প্রাণটি থাকে এবং এখন নিরাপদে আছে কিনা দেখা দরকার।

কিন্তু এখানেই শেষ নয়, রসরাজ আরও বলেছিল—'মেয়েমানুষ কখনও আপন হয়? খাওয়াও, পরাও, স্নো-পাওডার, মায়া-শাড়ি দাও, কোলজুড়ে ছেলেমেয়ে দাও, মন পাবে না। আর বুড়ো হলেই কি কেয়ার করে, বিশেষ করে রেস্ত যদি না থাকে? কক্‌খনও না। শালা নিজের মেয়ে পর্যন্ত আপন নয়—বাঁচলে জামাইয়ের, মরলে যমের।'

পানের জন্য রসরাজের যুক্তিজাল বিস্তার আর কাকুতি-মিনতি দেখে রতন খাসনবিস রীতিমতো বিরক্ত হয়ে বলল—'হালায় লক্ষণ পাঁড়ে তবু শুদ নিয়া টাহা দ্বার গ্যায়, হারুদার আত দিয়া একটা পানও গলায় না।'

হারুদা জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে একটু দেখে নিলেন, যেন গাড়ির গতি সব সময় তিনি লক্ষ রাখেন, গাড়ি কখন কোথায় পৌঁছায় তাও তার জানা, ফাঁকা মাঠ দেখলেও বলে দিতে পারেন গাড়ি ঠিক ঠিক যাচ্ছে, না লেট। তারপর উষ্মার সুরে বললেন—'কেবল হারুদা, হারুদা, হারুদা! তোমরা শালা সাক্ষাৎ যম, বলে কয়ে মানুষ খুন করতে পারো।'

রতন বলল—'আরে চটেন ক্যান হারুদা? আপনার নাগাল বুড়ার লগে চইলা ফিরা হালার পোলাগো ডর হ্বয় নাই—অহ্ব্যাস খারাপ হইয়া গাচে।'

সবাই হেসে উঠল। হারুদা গম্ভীর হলেন। খুব যেন আনন্দ হয়েছে তেমন করে সদানন্দ বলল—'হ্যাখ্ মাইরি, হারুদাকে এখন বেয়াই বেয়াই মনে হচ্ছে!'

হাসবেন কি গম্ভীর হবেন বুঝতে না পেরে হারুদা মাথা নত করলেন। অবস্থাটা বুঝে রসরাজ কিছু সান্ত্বনার সুরে বলল—'যাই বলিস তোরা, হারুদা আমাদের নড়বড়ে খুঁটি। মাঝেমধ্যে দু'এক খিলি পান দিয়ে দিব্যি চালায়। জানলেন হারুদা, আপিসেও আপনার মতো আরেকটা নড়বড়ে খুঁটি আমার আছে। আগের দিনে সে আমার অ্যাটেণ্ডান্স ম্যানেজ করে দিত।'

রসরাজের কৌশলটি ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা ভালই জানে। প্রতি হপ্তায় সে তখন একদিন কামাই করত। পরদিন গিয়ে একরোজ-বেতনের অর্ধেক টাকায় বড়বাবু ছোটবাবুদের চা-সিঙাড়া খাইয়ে দিত। এতে করে হাজিরা খাতায় আগের দিনের সইটাও করা চলত, অনুপস্থিত দিনের অর্ধেক মাইনেই বেঁচে যেতো—আবার পাওনা ছুটিতেও হাত পড়ত না।

হারুদার কিছু ভাবান্তর দেখা দিল। ডিবা খুলে তিনি তর্জনীর ডগায় একটু চূণ ভরিয়ে নিলেন, তারপর পানরসসিক্ত টকটকে লাল জিহ্বায় সেই চূণ লাগিয়ে দিলেন। কিন্তু সবটুকু চূণের তাতে সদ্গতি হল না দেখে নিচের পাটির সামনের দুটি দাঁতে তুলে নিলেন। তারপর তর্জনী আর বুড়ো আঙুলের কায়দায় তিন টুকরো সুপুরী উঠিয়ে এমন করে রসরাজের হাতে দিলেন, যেন জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ বিতরণ করছেন। রসরাজ ভক্তলোক। সুপুরীর টুকরোগুলো যে হারুদার লালাসিক্ত, তা উপেক্ষা করে এবং একবারটি কপালে ঠেকিয়ে দিব্যি মুখে পুরে দিল। রতন আর সদানন্দকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকতে দেখে হারাণদা তাদেরও বঞ্চিত করলেন না। লালাসিক্ত

আঙুলের ডগা থেকে তারাও সুপুরীকুচি কুড়িয়ে নিল, তারপর শ্রদ্ধার সঙ্গে মুখে পুরে দিয়ে চিবুতে লাগল।

হারুদাকে রাগিয়ে ফুলিয়ে ক্ষেপিয়ে সময়টি সবার মন্দ কাটছিল না। তবে আরও একবার তিনি একটু চটে গিয়েছিলেন ; এক যাত্রীর গায়ে ভাল শাল দেখে রসরাজকে তারিফ করতে শুনে তিনি বলছিলেন —'হুঁহ্, একখানা শাল দেখেই চোখ ছানাবড়া। এমন বারোখানা শাল আমার ঘরে আছে।' সবাই তখন লক্ষ্য করে দেখেছিল, শীতে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা হারুদার পরণে মোটা তাঁতের ধুতি, গায়ে আধ-ময়লা টুইল শার্ট—তার উপর চৈতন্য-ফ্যাক্টরির সুতী-চাদর জড়ানো। বারোখানার একখানা শালও কি হারুদা গায়ে দিয়ে আসতে পারতেন না? কিন্তু রসভঙ্গ হবার ভয়ে কেউই মুখ খোলে নি।

হাতি-ঘোড়া মারতে মারতে সবার সময় কাটে। চলন্ত গাড়িতে দ্রুত চলন্ত সেই সময়ের মধ্যে ভিক্ষুক ভিক্ষা চায়, সহযাত্রীরা একখিলি পান, দুটি সুপুরী-টুকরো, নয়তো একটা বিড়ি চায়—এর চাইতে খুব বড় প্রার্থনা কারও নেই। কিন্তু বাড়িতে বসে থাকলে অনেকের অনেক দাবী মেটাতে হয়—চাল কেনো, ভোট দাও, কুটুম্বিতা কর। এবং হাত পাতলে গিন্নীকে টাকা দে'২। 'য ডেইলি প্যাসেঞ্জারিতে কতই না সুখ!

শুধু নেপাল, নেপাল, নেপাল—কেউ নেপালবাবু বলে না, মিস্টার মুখার্জীও ডাকে না। কিন্তু নেপাল চন্দ্র মুখার্জীর ভ্রুক্ষেপ নেই—সে যে একজন গ্র্যাজুয়েট, এক কালে এম-এ পড়ত, সে কথাও তার মনে পড়ে না। হপ্তায় ছ'দিন দুবেলা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে সে চাকুরি চালায়। সম্প্রতি বিকেলে আবার ল' কলেজেও পড়ছে। বাইরের লোকের মধ্যে বোধ হয় বিশপবাবু ছাড়া আর কেউই জানে না, নেপাল মুখুজ্জে ল' পাশ করে নিজের ডিপার্টমেন্টে সরাসরি অফিসার হবার আশা পোষণ করছে।

ডেইলি প্যাসেঞ্জারির কল্যাণেই বিশপবাবুর সঙ্গে নেপাল মুখুজ্জের পরিচয় এবং শেষপর্যন্ত কিছু অন্তরঙ্গতা। বৈশাম্পায়ণ বটব্যালের পাদরি-পাদরি চেহারা দেখে বিনতা নন্দীই যে বিশপবাবু নাম দিয়েছিল, নেপাল তা প্রথম শুনেছিল বিশপবাবুর কাছেই। এবং অন্য অনেককেও শুনিয়েছিল। নেপালও বৈশাম্পায়ণকে বিশপবাবু ডাকে, যদিও নেপালের বিশপ আর বিনতার বিশপ এক নয়। বিশপবাবু সেদিন নেপালের আপিসে গিয়েছিল তার এক বন্ধুর কাজ মেটাতে। নেপাল তাকে ঠিকই খাতির করেছিল, তবে মৌখিক খাতির। তাই বা আজকাল আর কে কাকে করে?

দ্বিতীয় সাক্ষাতেই কিন্তু বিশপবাবুকে নেপাল কিছু সঙ্কেত দিয়েছিল, সাবধান সঙ্কেত—'কি বলব মশাই, কত রকমের মক্কেল যে আমার আপিসে আসে, তার কি অন্ত আছে?' নেপাল মুখুজ্জে সবার কাছে আপিসটাকে 'আমার আপিস' বলেই চালিয়ে দেয়।

বৈশাম্পায়ণ বলেছিল—'আপনার আপিস বলেই তে এমন হয়, নইলে—'

বাধা দিয়ে নেপাল বলেছিল—'আরে মশাই, এলেই তো হল না, কাকে দিয়ে কি কাজ হবে জানা চাই। তা তো নয়, লোকে সোজা গিয়ে ঢোকে সায়েবের ঘরে। বলি, সায়েব জানেটা কি? আমার আপিসে ডের হাজার ফাইল আছে। আমি ছাড়া কার সাধ্য আগলায়?'

বিশপবাবু অবাক হয়ে গিয়েছিল—'দেড় হাজার ফাইল! সায়েব এতো ফাইল কখন ছাখেন?'

নেপাল ততোধিক অবাক হয়ে জবাব দিয়েছিল—'আপনিও যেমন! আপিসে কেন দেখবেন? রোজই গাড়িতে তুলে ডজন দুই করে বাড়িতে নিয়ে যান। গিন্নী ছাখে, ছেলেমেয়েরা ছাখে—ফাইলের স্তূপ দেখেই তারা ভাবে, সায়েব যথার্থই বড় চাকুরে। পরদিন যথারীতি ফাইল ফেরত আসে। সায়েবের সঙ্গেই। শেষপর্যন্ত জের পড়ে এই শম্মার উপর। জরুরি কেসের যত সব মক্কেল এসে ধন্না দেয়।'

'আর আপনাকে বুঝি সব ফাইল বের করে দিতে হয়?' বিশপবাবু মুখে কথা এগিয়ে দেবার মতো করে বলেছিল।

নেপাল মুখুজ্জে রেডিমেড জবাব দিয়েছিল—'পাগল, ওসব বাড়িফেরত ফাইলের কোন সাকিন ঠিক আছে না কি! আজ যে সব ফাইল ফিরে এলো, সে তো কাল-বাড়ি-নেওয়া ফাইল নয়। বাড়িতে রোজই ফাইল যাচ্ছে, বাড়ি থেকেও রোজ আসছে, এই যা—যাহোক করে ব্যবসা চালু রাখার মতো, বুঝলেন কি না? কবেকার ফাইল জানতে আমার দায় পড়েছে!'

'তা হলে মক্কেলদের উপায়?' বিশপবাবু শুধিয়েছিল।

নেপাল অক্লেশে বলেছিল—'যারা সোজা গিয়ে সায়েবের সঙ্গে দেখা করে, তাদের ফাইলের তলব পড়লে আমি খানিক এদিক ওদিক করি, দশ মিনিট বাদে গিয়ে স্রেফ বলে দিই—খুঁজে পেলাম না। বারকয়েক ফাইল না পাওয়া গেলেই বাছাধনরা টের পেয়ে যান, মালকড়ি কিছু ছাড়তে হবে। মাস গেলে আমার চৌদ্দ পনেরো শ'টাকা কি আর এমনি-এমনি হয়!'

কথা বলতে বলতে নেপালচন্দ্র খৈনি টিপছিল। অথচ মুখের পান তখনও শেষ হয় নি—খোশবো জর্দার মনোমোহন গন্ধ মুখে তখনও লেগে আছে। ব্যাপারটি এই, আর্দালী হয়েও যে মাস-গেলে চৌদ্দ-পনেরো শ' টাকা সে রোজগার করে, সে যেন তার অশেষ

কৃতিত্ব। এবং হয়তো সেই কারণে আপিসে নেপাল সব সময়ই একটু বেশ মৌজে থাকে; যখন যেটি মন চায়, তখনই তা ভোগে লাগায়—তা চপ-কাটলেট যোগে চা-কফিই হোক, কিংবা খইনি, জর্দাপান, ইণ্ডিয়া কিং সিগারেটই হোক।

সত্যি নেপালরা সব অদ্ভুত লোক। তাদের চাকুরি চাই, উপরি চাই, যতো সব চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় বস্তু চাই। মুহুর্মুহু চা-পান-সিগ্রেট চাই—তারপর আবার শোবার জন্য সঙ্গে একটি মেয়েমানুষ চাই! নেশার বস্তু ভোগের সামগ্রী সব সময় তাদের হাতের কাছে না থাকলে চলে না।

নেপাল মুখুজ্জে একটি মজার কথা বলেছিল—'কি বলব বিশপবাবু, আমার আপিসের সায়েবের কিন্তু কোন নেশাই নেই, এক কাপ চা পর্যন্ত তিনি খান না। তবে হ্যাঁ, সায়েব আমাকে ভালবাসেন বটে, রোজ পাঁচ টাকা পকেট খরচাও দেন। কেনই বা দেবেন না বলুন? জাত ভাই বটে তো—মুখার্জী!' এরপর গলা খাটো করে প্রায় ফিসফিসিয়ে নেপাল আরও বলেছিল—'জানলেন, ফাইল না পাওয়া গেলেও সায়েব আমাকে কিছু বলেন না। তিনি ধরেই নেন, নেপাল মালকড়ি কিছু নিশ্চয় পায় নি!'

নেপাল মুখুজ্জে কৃষ্ণনগর-কলকাতা করে, কিন্তু রোজ এক-গাড়িতে বসে নয়—রাণাঘাটে পৌঁছে শান্তিপুর লোকালে তার বসা চাই। মাসে চার-পাঁচদিন তো বটেই। বিশপবাবুর প্রায় একই স্বভাব। অবশ্য গাড়ি না পাল্টিয়ে সে কামরা বদলায়—রাণাঘাট কল্যাণী নৈহাটিতে নতুন কামরায় ওঠে। নেপাল কেশনগর লোকাল থেকে নেমে শান্তিপুর ধরে। অথচ দুটো গাড়িই কিন্তু দু'এক মিনিটের ব্যবধানে শিয়ালদা পৌঁছায়।

কেশনগর থেকে উঠে এসে শান্তিপুর লোকালে বসে পড়ার লোক আরও যে না আছে তা নয়। অথচ আপাতদৃষ্টিতে কৃষ্ণনগর এবং শান্তিপুর শহর প্রায় সাপে-নেউলে—চলতি গাড়িতে এ-ওকে ঠোকে, সে-তাকে তোড়ে উড়িয়ে দেয়। আজ গত বছরের

সরস্বতী পুজার প্রসঙ্গ উঠেছিল। ঠাকুর গড়ার কত চোখ-ধাঁধানো কায়দা যে থাকতে পারে, কৃষ্ণনগরের শিল্পীরা নাকি তার প্রমাণ দিয়েছিলেন সরস্বতীর মূর্তি গড়ে—উলের ঠাকুর, পাট-সাবান-চিঁড়ের ঠাকুর কৃষ্ণনগরই সর্বপ্রথম তৈরী করার গৌরবার্জন করেছিল। কিন্তু এই প্রতিভাবিকাশের অপর দিকটা খুব উপেক্ষার নয়, কারণ এরই সূত্রে কৃষ্ণনগরে নিদারুণ রেষারেষি সৃষ্টি হয়েছিল।

ভাসানের ঠিক একদিন আগের ঘটনা; খড়-মাটি-রঙে গড়া প্রতিমা দেখে বোধ হয় নবীন দলেরই এক উগ্র সমর্থক মন্তব্য করল—'ইস, একেবারে চল্লিশ বছরের বুড়ি মাইরি, চোখে মুখে দেবীত্ব নেই। দেখুক তো গিয়ে আমাদের মোমের ঠাকুর—অনন্তযৌবনা উর্বশী!' ব্যস, এ শুধু তো অকরুণ মন্তব্য নয়, চকমকির বাক্সে বারুদ ঠাসা। সুতরাং রাতও পার হল না—যতো সব চিঁড়ে, মোম, সাবানের প্রতিমা পুড়ে ছাই হয়ে গেল। এবং কৃষ্ণনগর শহরের আপন লোকের আগুনে। তারপর সে কি মারামারি! কিন্তু সবচেয়ে বড় দুঃখের কথা, খবরটি যথাসময়ে শান্তিপুরে পৌঁছে গেল। এজন্য আর কার কি হল খোদায় মালুম, কিন্তু নেপাল মুখুজ্জে লজ্জা পেল সবচাইতে বেশি। শান্তিপুরের কাছে সে যেন হেরে গিয়েছিল।

মূর্তিগড়ার কায়দাকৌশল নিয়ে এই নেপাল মুখুজ্জে আজ বেজায় গর্ব করে বলেছিল—'হাজার হলেও গোয়াড়ি-কেশনগর বটে তো! চিরদিন প্রতিভাধর শিল্পীর জন্ম দিয়ে এসেছে।'

নেপালকে তলিয়ে দেবার মতলবে শান্তিপুরের অসীম প্রমাণিক সঙ্গে সঙ্গে বলল—'তোমাদের কীর্তি সব আমাদের জানা আছে। ঠাকুরের মুখে আবার কে কোথায় আগুন দেয় শুনি? কেশনগরের লোকেরা তাও দেয়। শুধু কি তাই? ঠাকুর দেখার নাম করে পাড়ায় পাড়ায় চ্যাংড়াগুলো হাঁ করে সব মেয়ে ছ্যাখে, ভাসানের দিনে ঠাকুরের সঙ্গে লরিতে তাদেরও তুলে নেয়। তারপর খেমটা নাচ নাচে। মেয়েগুলো সেই উত্তেজনায় অজ্ঞাতে যোগ দেয়, নেচেও ফেলে।'

নেপাল মুখুজ্জে ব্যঙ্গের সুরে বলল—'আহা, শান্তিপুরের তোমরা তো সব ব্রহ্মচারী লোক। মেয়ে-দেখা তোমাদের সয় না! কিন্তু দেখার মতো মেয়ে তোমাদের শান্তিপুরে আছে, যে হাঁ করে দেখবে, লরিতে তুলে নিয়ে নাচবে আর নাচাবে—নাকি সেই হিম্মত তোমাদের আছে?'

অসীম প্রামাণিকের জবাব একেবারে তৈরীই ছিল। শ্লেষের সুরে সে বলল—'থাক বাপু, থাক। তোমাদের নাচানাচির সব কথা জানতে আমাদের বাকি নেই। গোয়াড়ির এক নাচওয়ালী আমাকে কি বলেছে জান?—কেশনগরের ছেলেগুলো কি বদ মাইরি, লরিতে ওদের সঙ্গে নেচেছিলাম বলে পত্রিকায় তুলে দিয়েছিল। নাচও দেখবে, আবার দুর্নামও করবে!'

নেপাল মুখুজ্জে জবাব দেবার জন্য তখন খুবই ব্যগ্র, অথচ ঠিক কথাটি যেন ঠিক সময়ে মুখে আসছে না। সুযোগ পেয়ে অসীম প্রামাণিক শান্তিপুর-গর্বে আরও মুখর হয়ে উঠল—'যাও দেখি একবার রাসের শান্তিপুরে। একেবারে রসের শান্তিপুর। রাস্তাঘাটে রূপের আলো ঝলমল করে। একসঙ্গে এতো সুন্দরী মেয়ে শান্তিপুর ছাড়া আর কেউ কোথায় ছাখে, নাকি তেমন কথা শোনে? আড়াইশ বছর লোকে আমাদের শান্তিপুরে এমন রূপ পথে ঘাটে দেখে আসছে, একেবারে রাসের সূচনা থেকে। এই চলন্ত ইতিহাস এখনও চলছে, চলবে।'

নেপাল মুখুজ্জে কি আর ছেড়ে কথা কইতে পারে? তর্জনের সুরে সে বলল—'আড়াইশ বছরের রাসের ইতিহাস আমরা কি আর না জানি? রসের ইতিহাসই বটে, আদিরসের। মদসেবা, ঢলাঢলি, মেয়ে-মদ্দ মিলে একঘাটে ন্যাংটো-চান, তারপর খিস্তি-খেউর—এই তো রাসের শান্তিপুর? কে না জানে শুনি? বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী বন্ধ না করে দিলে আজও বোধহয় সে-রস ঝরত!'

বিরোধী দলের যুক্তি নাকচ করে দেবার জন্য হারুদা চিৎকার করে উঠলেন—'এসব মিথ্যাকথা।'

কিন্তু নেপালচন্দ্র শান্ত শ্লেষের সুরে বলল—'ভাগ্যিস রাণাঘাটের ডেপুটি-কবি নবীন সেন শান্তিপুরী বেলেল্লাপনা আর খিস্তি-খেউড়ের ইতিহাস-রসায়ন পাকা করে লিখে গিয়েছিলেন—"শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব / নতুন নতুন ঠাঁটে খেড়ু শোনাইব।" নইলে কি আর আজ আমি তোমাদের সামনে দাঁড়াতে পারতাম!'

চাবুক মারার ঢঙে অসীম প্রামাণিক বলল—'হাজার হলেও তোমরা কেশনগরের লোক, পাঁক-ঘাঁটা তোমাদের আসল অভ্যেস। নইলে 'কান্তি ভাল শান্তিপুরের মেয়ে' এমন কবিতাও তোমাদের চোখে পড়ত।'

নেপাল মুখার্জীর সমর্থক শান্তিপুর লোকালে বড় কেউ ছিল না। অসীম প্রামাণিকরা একে তো দলে ভারি, তার উপর সবার মনোভাবটি এমন, যেন গাড়িটিও শান্তিপুরের লোকের। তবু একাই একশর মতো নেপাল বলল—'কবিদের খেয়েদেয়ে আর কাজ নেই, শান্তিপুর-সুন্দরী নিয়ে তারা কাব্যি করবেন, কবিতা লিখবেন।'

অসীম প্রামাণিক সঙ্গে সঙ্গে বলল—'কাড়ি কাড়ি লিখেওছেন তে'—শান্তিপুরের শালী ভাল, ভাল তার খোঁপা—কিহে, শুনেছ কখনও?'

শান্তিপুরওয়ালাদের আনন্দ আর ধরে না। তাদের অসীম প্রামাণিক যেন নেপালকে রাম-হারা হারিয়ে দিয়েছে, সমস্ত কেশনগরই যেন আজ শান্তিপুরের কাছে হেরে গেছে। হারুদা আনন্দের আতিশয্যে চঞ্চল হয়ে পড়লেন, তারপর কণ্ঠে ধ্বনি দিলেন—'হরিবোল!'

রসময়ী শ্যালিকার খোঁপাটি ভাল হলে তাকে কেমন মানায়, কেমন তাকে দেখতে হয়, তাই কল্পনা করতে করতে ক্ষণিকের জন্য নেপাল মুখার্জী কিছু অন্যমনস্ক হল। কিন্তু তা হলে কি হয়? তর্ক বড় বিষম বস্তু। প্রতিপক্ষের কাছে কি আর কেউ হার স্বীকার করতে চায়? পরম তাচ্ছিল্যে নেপাল মুখুজ্জে এবার বলল—'ছুদ্দুর, শান্তিপুর কোথায় পাবে তেমন সুন্দরী? এখন তো শুধু গোঁসাই তাঁতী পচাভুঁর, এই তিনে শান্তিপুর। ঠিক কিনা বলো?' কিন্তু অসীম

প্রামাণিকের জবাবের অপেক্ষা না করে নেপাল নিজেই বলতে লাগল —'হ্যাঁ, এখনও রাসের শান্তিপুরে রূপের হাট বসে বলে শুনেছি। তবে সে মাল নাকি শান্তিপুরের নয়—কলকাতার সোনাগাছি, হাড়কাটার বেবুশ্যেরা রাসের শান্তিপুরে গিয়ে পয়সা কামায়, ফড়েদের পকেট ভারি করে, তারপর শেয়ালদার টিকেট কাটে।'

শান্তিপুরওয়ালারা প্রায় ক্ষেপে গেল। শান্তিপুরে সুন্দরী নেই? কি অভব্য মিথ্যা! তা হলে বারোমাস যাদের শহরময় চলতে দেখি তারা তো দেউলীর বাউলী নয়। তবে? রাসের দিনে শান্তিপুর-ওয়ালীরা ঘরের দরজা বন্ধ করে বসে থাকে, আর যতো সব বাইরের মাল রাস্তায় টহল দেয়? শালা নেপাল মুখুজ্জে বড় বেতমিজ লোক!

কিছুক্ষণ হৈ হৈ হল, নেপালের বিরুদ্ধে কিছু কটুকাটব্যও চলল। নেপাল ক্ষীণ কণ্ঠে কিছু বলতে চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত থেমে গেল। অবশ্য সমস্ত গোলমাল থামতেও বেশি সময় লাগল না। হারুদা এতক্ষণ তেমন মুখ খোলেন নি। বেশি রাগ হলে তিনি আবার কথা বলতে পারেন না। অবশ্য তাঁর ইচ্ছা ছিল নেপালকে উত্তম-মধ্যম কিছু বসিয়ে দেওয়া! হট্টগোল থেমে যেতে তাকে কিছু ক্ষুণ্ণ হতে হল।

কামরার মহিলা ডি-পিরা নেপাল-অসীমের কথোপকথন এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। তবে হারুদা অ্যাণ্ড কোং-র সঙ্গে চোখাচোখি হলে তাদের উলের কাঁটা কিছু বেশি নড়ছিল, কিংবা বহিঃপ্রকৃতির দৃশ্যাবলী হঠাৎ মধুর ঠেকছিল; উদার দৃষ্টি মেলে তারা তখন চলন্ত মাঠ দেখছিলেন। নেপাল মুখুজ্জের কুশ্রী মন্তব্য শুনে অত্যন্ত রেগে তাকে বিষ-দৃষ্টিতে তারা দেখতে লাগলেন।

সুখের কথা, নেপাল মুখার্জী শেষপর্যন্ত অক্ষত দেহেই তার আপিসে পৌঁছাতে পেরেছিল।

ছয়

শর্মিলা রায় উঠেছিল শিমুরালী স্টেশনে, ঈশান কোণের মেঘের মতো। তার বড় বড় চুল, পটল-চেরা চোখ, ধনুক-টানা ভ্রু—শ্যামলা গায়ের রঙ। সব মিলিয়ে কেমন যেন মা-কালী মা-কালী চেহারা। বয়স এখনও আঠারো পেরোয় নি, দেখলে কিন্তু মনে হয়, কুড়ি-একুশের কম তো নয়ই। চঞ্চল যৌবন তার দেহে টলমল করে। শর্মিলা এ সম্বন্ধে পুরোপুরি সচেতন বলে মনে মনে ভাবে, পুরুষের মতো পুরুষের যথাযোগ্য দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এমনটিই দরকার। শর্মিলাও একজন ভেটারেন ডি-পি—কলকাতায় যায়, টাইপ শেখে, কলেজ করে ; এবং কেবলই দিন গোণে, কবে আর সবার মতো মনের আনন্দে চাকুরি করবে। চাকুরির বাড়া আনন্দ যেন আর কিছুতে নেই !

একটু আগে মণিমোহন গুণকে অপ্রয়োজনে ইংরেজী বলতে শুনে শর্মিলা ভেবেছিল, একটা ধমক দিলে কেমন হয়। দেশের মাটি, দেশের গাড়ি, দেশের সব—তবু কেন লোকে ইংরেজীতে বক বক করে সে ভেবে পায় না। শর্মিলা আসলে সরল প্রকৃতির মেয়ে, কিন্তু বন্ধু-বান্ধবীরা ভাবে, ঘটে বুদ্ধি কিছু কম আছে। তাদের মতামত সে হেসে উড়িয়ে দেয়।

'ইংরেজী কইতে তো আপনার দারুণ উৎসাহ দেখছি'—মণিমোহন গুণকে শর্মিলা বলল বটে, কিন্তু যতটা তীক্ষ্নতা কণ্ঠে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিল, ততটা ফুটল না।

মণি গুণ একরকম ধরেই নিল শর্মিলার এটি খোঁচা নয়। অবাক হয়ে সে বলল—'উৎসাহ কেন হবে না বলুন—বলে সুখ পাই যে।'

উপযুক্ত জবাব পেলে যেন ইংরেজী-বলা মাফ করা যেতে পারে তেমন করে শর্মিলা শুধাল—'আপনি কি কাজ করেন বলুন তো একবার।'

'কি না করি তাই শুধোন ?' মণিমোহন হাসতে হাসতে বলে শর্মিলার চোখে চোখ রেখে কি যেন একটা ভেবে নিল, তারপর সতর্কতার সঙ্গে বলল—'সংক্ষেপে বলতে পারেন ব্যবসা। ব্যবসা করি।'

'ব্যবসা করতে কি সব সময় আপনাকে ইংরেজী কইতে হয় ?'

'নাঃ! তবে নির্ভর করে কোন্ ব্যবসায়ের সূত্রে কখন কথা বলছি।'

'সেকি, আপনার অনেকগুলো ব্যবসা বুঝি!'

নির্বাক মুখে মণিমোহন গুণ তা-হলে-তো-বুঝতেই-পারছেন হাসি হাসল, তারপর কি ভেবে বলল—'একটু চা খাবেন, চা আর চানাচুর ?'

সম্মতির অপেক্ষা না করেই মণিমোহনের হকার ডাকা হয়ে গিয়েছিল।

শর্মিলার চা খেতে অবশ্য আপত্তি নেই, তবে একটু সঙ্কোচ আছে। একটু লজ্জাও।, হঠাৎ কি আর কাউকে অতিথি-আপ্যায়নের সুযোগ দেওয়া যায়, বিশেষ করে অজ্ঞাতকুলশীল লোককে ? চায়ের খুঁড়ি হাতে নিতে শর্মিলা কিছু ইতস্তত করছিল। ব্যাপারটি বুঝতে পেরেই মণিমোহন বলল—'খেতে হবে না, আপনি শুধু একটু হাতে তুলে নিন।' মুখে না বললেও 'তা-হলে-আমি-কৃতার্থ-হব' ভাবটি প্রকাশ পেল।

গাড়ির ঝাঁকুনি কিছু বেড়ে গেছে। যাত্রী ভিড়ও কিছু কম নয়। লেবুর হকার, ওষুধ ক্যানভাসার, চানাচুরওলাদের ডাক-হাঁকের সঙ্গে সম্মিলিত যাত্রীর কোলাহল মিলেমিশে ভেতরের অবস্থা কিছু বেসামাল। কথা বাড়ানো শর্মিলার ইচ্ছা নয়, অথচ চায়ের ভাঁড় হাতে নিয়ে যে কি করবে, তাও যেন বুঝতে পারছিল না। বিশপবাবুর দিকে চা এগিয়ে দিয়ে শর্মিলা বলল—'আপনি খান।'

মণিমোহন গুণের চলন্ত পরিমণ্ডলে সবার হাতে তারই-দেওয়া ভাঁড়ের চা ছিল। বিশপবাবুর হাতে ছিল না। চা খায় না বলে মণি গুণের অনুরোধ, শর্মিলার দান সে সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল।

তখন শর্মিলা আর কি করবে, চায়ের ভাঁড় ঠোঁটে ঠেকিয়ে সামান্য একটু চুমুক দিল, তারপর কৌণিক দৃষ্টি ফেলে বিশপকে বলল— 'আপনি যে চা খান না আপনাকে দেখে প্রথম দিনই তা বুঝেছিলাম।'

'তবু কেন দিতে এলেন?' মৃদু হেসে বিশপবাবু বলল।

'দেখছিলাম, যদি—'

'যদি শেষ পর্যন্ত নিই?' কাঁধ ঝেঁকে বিশপ বলল—'আমি কিন্তু দেখি, ক'কাপ ক'জন রোজ এগিয়ে দেয়।'

'দর বাড়ান বুঝি?' কিছু আবদারের সুরেই শর্মিলা রায় বলল।

'দর নয়', শর্মিলাকে সংশোধন করে বিশপ বলল—'আদরই বলতে পারেন। কিন্তু ছোট্ট একটি প্রশ্ন আছে! কে চা খায়, কিংবা না খায় আপনারা তা কি করে বুঝতে পারেন বলুন তো?'

'কেন, আপনারা কি কম বোঝেন?' এবার বেশ গম্ভীর হয়েই শর্মিলা বলল।

বিশপবাবুর হাসি পেল। 'আপনারা' বলতে শর্মিলা যে পুরুষদের কথাই বোঝাতে চেয়েছে সে কথা বুঝতে বিশপবাবুর অসুবিধা হল না। মুহূর্তকাল চুপ করে থেকে সবার দিকে চোখ ফিরিয়ে বিশপবাবু বলল—'ঠিক বলতে পারব না। তবে একটা কথা কিছুতেই বুঝি না, পুরুষের এতো কথা আপনারা কি করে বোঝেন।'

শর্মিলা জবাব দিল না বটে, তবে মুখে তার 'বটেই-তো' রকমের হাসি ফুটল। ছোঁয়াচে রোগের মতো তা নিমেষে চন্দনা বিনতাকেও স্পর্শ করল। কারণ আছে। তাদের দৃষ্টি বোধ হয় যাকে বলে মেয়ে-দৃষ্টি। পুরুষকে প্রায়শ তারা সেই দৃষ্টিতেই দেখে। প্রথম দর্শন থেকে বিশপকেও তারা জরিপ করছিল—বয়স কত, বিবাহিত কিনা, লেখাপড়া কদ্দুর, আর রোজগার কত হতে পারে ইত্যাদি নিয়ে তাদের গবেষণার অন্ত ছিল না। মানসিক গবেষণা। বিশপ যে চা খায় না সে সিদ্ধান্তও হয়তো সেই গবেষণার ফল।

শর্মিলাদের মনোযোগ ক্রমে বিশপবাবুর দিকে কেন্দ্রিত হতে দেখে মণিমোহন গুণ মনে মনে বেশ বিরক্ত হল, তবু সতর্কতার সঙ্গে মনের

ভাব চেপে শর্মিলাকে হঠাৎ একটি অনুরোধ করল—'এবার একটি গান করুন।'

শর্মিলা অবাক হয়ে বলল—'ওমা কি গান, কার গান?'

মণি গুণ খুব স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল—'বিধান রায়ের গান।'

'বিধান রায়ের গান! তিনি আবার গান লিখলেন কবে?' অবাক হয়ে চন্দনা চক্রবর্তী প্রশ্ন করল বটে, তবে সবার বিস্ময়ই তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল। হাসি চাপতে সবাইকে কিছু বেগ পেতেই হল।

মণিমোহন গুণ কিন্তু একটুও অপ্রস্তুত না হয়ে ঘোষণা করল—'লিখতেন, বিধানচন্দ্র আলবৎ গান লিখতেন—সেই ডাক্তারী পড়া কালে।'

ডাক্তারী পড়াকালে বিধানচন্দ্র রায় যে গান কখনও লেখেন নি, চন্দনারা সে বিষয়ে শুধু নিশ্চিতই নয়, কথাটি যে আজগুবি এবং হাস্যকর, সে বিষয়েও তাদের কোন সন্দেহ ছিল না। মণিমোহন বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্র-সঙ্গীতের কথা, অথচ তলে তলে ভদ্রলোক বিধানচন্দ্রের ভক্ত।—কিন্তু কোন্ কথার কি সূত্রে যে বিধান-প্রসঙ্গ ওঠে সে ধারণা নেই। অথবা সব কিছুই তার ভাণ।

হাসাহাসির অশোভনতা চাপা দিতে প্রসঙ্গ পাল্টানো দরকার। মণিগুণের ভাঁড়ের চায়ে চুমু খাওয়ার মতো করে চুমুক দিয়ে এবার চন্দনা তাই বলল—'জানেন, শর্মিলার মস্ত বড় একটি গুণ আছে?'

কৌতূহলাবিষ্ট মণিমোহন বলল—'নাকি!' একটি মাত্র ভাবই তার কণ্ঠে প্রকাশ পেল—যেন খনিতে অনেক মণিরত্ন লুকিয়ে ছিল, চন্দনা চক্রবর্তী বিনাশর্তে তা এইমাত্র প্রকাশ করে দিয়েছে। অথচ এতদিন সে জহুরি চেনে নি। চন্দনাকে তেমন লক্ষ্য করেই দেখে নি।

চন্দনা চক্রবর্তী অবশ্য বেশিদিনের ডেইলি প্যাসেঞ্জার নয়, তবে এরই মধ্যে নিত্য-যাত্রায় বেশ রপ্ত হয়ে উঠেছে। মণিমোহনকে এই কামরায় আরও দু'একদিন যে সে না দেখেছে তা নয়।

এই সেই চন্দনা চক্রবর্তী, চাকুরিকে জীবনের সব চাইতে বড় সম্বল বলে যে মনে করে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষা করে—যত্নের সঙ্গে লালন করে। এখন দিব্যি সহজ সুরেই সে কথা বলছিল, তবে সকালের দিকে তার উপর দিয়ে ঝড় বয়েই গেছে।

আজ দেরি করেই চন্দনা ঘুম থেকে উঠেছিল, তারপর কোনমতে চান সেরে শাড়ি পরে দে দৌড়। চুলগুলো তখনও ভিজে—তেল পড়ে নি, চিরুনীর আঁচড় পড়ে নি। তবু-যা-হোক, ফেল করতে করতে স্টেশন-বাসটি সে পেয়ে গিয়েছিল। তারপর সিটে বসে অমিতার চিরুনী ধার করে কিঞ্চিৎ কেশ-সংস্কার করছিল। সামান্য চিরুনীটি যে কত মূল্যবান বস্তু জীবনে আজই যেন সে প্রথম বুঝেছিল। কিন্তু মাথায় চিরুনী পড়লে হবে কি, চন্দনাকে দেখাচ্ছিল যেন বদহজমের রোগীটি—চিন্তাক্লিষ্ট, দুঃখপিষ্ট।

মুখচেনা রাসুকাকা শুধিয়েছিল—'কেমন আছো চন্দনা?' চন্দনা বলেছিল—'আর কেমন? চাকুরি করছি। সুখে আছি।' সত্যি চাকুরি-পাওয়া সুখের কথা, নাকি সদ্যস্নাতা অভুক্তা মনক্ষুণ্ণা ডেইলি প্যাসেঞ্জারের শ্লেষ-ভাষণ, ঠিক বোঝা যায় নি।

অমিতা বলেছিল—'আজ বরং আপিস কামাই করলেই পারতিস, চন্দনা। এমন ভিজে চুলে থাকলে অসুখ করতে পারে।'

অমিতার কাছ ঘেষে বসে চন্দনা বলেছিল—'অনেক কষ্টে চাকুরি পেয়েছি। অস্থায়ী চাকুরি। জানিস তো, যার পোস্টে আছি, তিনি প্যারালাইসিসে ভুগছেন। একবার যখন পেয়েছি, চাকুরি আমি হারাতে চাই নে।'

কথাটি নিজের কানেই তার খারাপ লেগেছিল, একটু দম নিয়ে আবার তাই চন্দনা বলেছিল—'অবশ্য ভদ্রমহিলা চিররুগ্না হয়ে থাকুন, আর আমি তার শূন্যপদে কায়েম হয়ে বসি, তা আমি চাইনে। কখনও না। আমি নিজের জোড়েই নিজের পদে বহাল থাকব।'

মণি গুণের যেচে-দেওয়া চা এবং কামরার হালকা তালের কথা

মনটাকে তার এবার চাঙ্গা করেছে। অবশ্য এটি তার অগ্রিম-চা। নৈহাটিতেই চন্দনা রোজ শেষবারের মতো চা খায়। ভাঁড়ের চা। ভাঁড়ের চা হাতে এলে অনেক সময় তার এক আত্মীয়ের কথা মনে পড়ে। বিলাত যেতে বোম্বের পথে খড়্গপুরে শেষবারের মতো ভদ্রলোক ভাঁড়ের চা খেয়েছিলেন।—বাংলার বাইরে চা তো আর ভাঁড়ে মেলে না! কিন্তু সেই তার শেষযাত্রা, সেই তার বাংলার মাটিতে শেষ চা খাওয়া।

শর্মিলার মস্তবড় গুণ সম্বন্ধে চন্দনার ঘোষণা শুনে মণিমোহন গুণ আগেই বেশ হৃষ্ট হয়েছিল। সে নিজে মনি গুণ, সর্বগুণাধার—আপন দলের লোকেরা বলে গুণমনি। চন্দনাকে সে বলল—'শর্মিলা দেবীর মস্তবড় গুণটি কি শুনি?'

চন্দনা সগর্বে বলল—'শর্মিলা খুব ভাল হাত দেখতে জানে।'

মনিগুণ এবার খুবই অবাক হয়ে বলল—'নাকি!' 'নাকি' হচ্ছে তার 'তাই নাকি, তাই-বুঝি'র সংক্ষিপ্ত প্রকাশ।

চন্দনার উৎসাহে এবং শর্মিলার প্রশ্রয়ে মণিমোহন তার ডান হাতের তালুটি মেলে ধরল। আপন বাঁ-হাতে সেই হাত ধরে এবং কোলের কাছে রেখে শর্মিলা রায় ধীরে ধীরে জ্যোতিষ-চর্চা শুরু করে দিল। তার ডান হাতের আঙুলে হস্তরেখা বুলিয়ে নিতেই মণিমোহনের মনে হল, ছেলেবেলার ভূগোল শিক্ষক ম্যাপ-পয়েন্টিং শিখিয়ে মুহূর্তের মধ্যে যেন দূরকে নিকট করে দিয়ে বলেছেন—'এই দ্যাখো, দিল্লী লণ্ডন ফিলাডেলফিয়া!'

মণিগুণের হাতে আঙুল চালিয়ে শর্মিলা বলল—'আপনি খুব সিগারেট খান বুঝি?'

হিসেবী মণিমোহনের মনে মনে ঠিক করাই ছিল, গণক-ঠাকরুণ যা বলবেন, তাতে সঙ্গে সঙ্গে একমত হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। খুশির আতিশয্য দেখিয়ে মণিগুণ বলল—'ঠিক ধরেছেন। আমি একেবারে চেইন-স্মোকার।'

একটু অহিংস রকমের খোঁচা দিতেই বিশপবাবু বলল—'কিন্তু

পনেরো মিনিটের মধ্যে আপনার হাতে সিগারেট দেখেছি বলে তো মনে হয় না।'

মণি গুণ আত্ম-সমর্থনের জন্য বোধ হয় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মেয়েগুলোর মুখে কিছু বেতাল রকমের হাসি দেখে চুপ করে গেল। শর্মিলা পুনরায় গম্ভীর মুখে গণকগিরি শুরু করে বলল—'আপনি মেয়েদের সঙ্গে মিশতে খুব পছন্দ করেন—হ্যাঁ, সব মেয়েকেই বিশ্বাস করেন, ভালবাসতে চান। দুঃখের বিষয় কেউ শেষ পর্যন্ত টেঁকে না।'

টেঁকে আবার না! মণিমোহন একটু বিদ্রূপের হাসিই হাসতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ মুখের ভাব পাল্টে এমন করে তাকাল, যেন দৈববাণী শুনছে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভালবাসলে কোন্ মেয়ে কবে ধরা দেয়। কোন্ ছেলে কোন্ মেয়েকে ভালবাসার মতো করে পায়? ধূর্ত মণিমোহন তার উত্তর ঠিক জানে এবং মানেও। তবে টিঁকিয়ে রাখার টেকনিকও তার অজানা নয়। শর্মিলার দ্বিতীয় গণনার পরিপ্রেক্ষিতে মণিমোহন সবিনয়ে সংক্ষিপ্ত একটি মন্তব্য প্রকাশ করল—আশ্চর্য তো!'

কথাটি দ্ব্যর্থবোধক—এমন অর্থও হতে পারে, শর্মিলার গণনা বিলকুল মিলে গেছে, অথবা একেবারেই মেলে নি।

তৃতীয় গণনা ঘোষণা করে শর্মিলা বলল—'আপনি বড় খরুচে লোক—পয়সা হাতে রাখতে পারেন না।'

মণিমোহনের মুখে বিচিত্র একটি হাসি ফুটল। আজকের কথা নয়, ইস্কুলের জীবন থেকে সে পয়সা করতে এবং পয়সা রাখতে শিখেছে। মাস-বরাদ্দ টাকার অঙ্ক ছলে-ছুতোয় বাড়িয়ে মণিমোহন বাবার কাছে বিস্তর টাকা আদায় করত। ধন-সম্পত্তির আসল মালিক বাবা এবং তা যে নিজের করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, সে-জ্ঞান তখনই তার টনটনে ছিল। 'পরের হাতে ধন, পেতে অনেকক্ষণ' এখনও তার কছে কম অর্থবহ নয়।

ইস্কুল-বোর্ডিংএ পালাক্রমে ছাত্ররা তখন মাস-মাস ম্যানেজার

হচ্ছে। যে মাসে মণিমোহনের উপর দায়িত্ব এলো, মা-বাবাকে সে একটি চিঠি লিখল—'আপনাদের শ্রীচরণের আশীর্বাদে এবার আমি বোর্ডিং-র ম্যানেজার হইয়াছি। এখন কিছু কম পাঠাইলেও চলিবে।' এটি আসলে পিতৃদেবের বিশ্বাস উৎপাদনের কৌশল মাত্র। পিতার অশেষ বিশ্বাস জীবনে খুবই তার কাজে লেগেছে। অর্থ হাত-করার কাজে।

শর্মিলা রায়ের গণনা না মিললেও মণিমোহনের খারাপ লাগছিল না। একে তো ভর-যুবতীর কোলের উপর হাত রেখে বিনা পয়সায় হাত-দেখানো, তার উপর আবার মন-যোগানো সব কথা—ভাল না লেগে আর পারে? তবে একথাও ঠিক, ঠিকেদারির কাজে তাকে যথাস্থানে খাম পাঠাতে হয়, হোটেলে উঠানা শুনতে হয়, বাসের লাইসেন্সের জন্য মাল ছাড়তে হয়—সবই পেল্লায় পেল্লায় খরুচে ব্যাপার। এক হিসেবে খরুচে লোক ছাড়া সে আর কি!

অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। আরও এক ভাঁড় চা এবং কিছু 'টা'র কথা মণিমোহন ভাবছিল। কিন্তু চায়ের হকারের বদলে গুপীযন্ত্র-হাতে এগিয়ে এলো রামদাস, এসেই বলল—'আজ আপনাদের দাঁত তুলব!'

কারও কোন আতঙ্কের লক্ষণ না দেখে রামদাস হালকা হাসি হেসে আবার বলল—'আপনাদের দাঁত তুলব, মানে দাঁতের ময়লা তুলব!' সবাই হেসে ফেলল। দাঁত তোলার মানে নাকি দাঁতের ময়লা তোলা!

ততক্ষণ রামদাসের বক্তৃতা শুরু হয়ে গেছে—'ভাববেন না যেন চালাকি করে দাঁতের মাজন বেচতে এসেছি। আজ আপনাদের গান শোনানই আমার কাজ।'

রামদাসের সঙ্গী তখন গুপী-যন্ত্রে ঘুটুম ঘুটুম টঙ্কার তুলতে শুরু করেছে। রামদাসের মতো সেও যুবাবয়সী, কিন্তু বড় নিস্তেজ। ক্ষীণ দেহী। মুখ শুকনো শুকনো। বোধ হয় কাল থেকে পেটে

দানাপানি পড়ে নি। রামদাস যুবক সঙ্গীকে যন্ত্রসঙ্গীতে উৎসাহ দিয়ে জনতার উদ্দেশ্যে বলল—'আপনারা গোল করবেন না, গোল করলে গান ভাল জমবে না। কারণ ভুললে চলবে না, এটি শান্তিপুর লোকাল। প্রেম-ভক্তি নিয়ে শান্তিপুর। নদীয়া-শান্তিপুর।'

নেহাত মামুলি বক্তৃতা। ডেইলি প্যাসেঞ্জারির তাজা সকালে সবাই কিন্তু শুনতে চায় যতো সব রসের কথা, যে কথার জোয়ার আর যোগান আসে জীবনের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র থেকে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে গিয়ে তার যেন কিছুই শোনা হয় নি, জীবনটি যেন বিফলে গেছে—সব সাধ আহ্লাদ বরবাদ হয়েছে। তবু সমস্ত অকিঞ্চিৎকরতা, সমস্ত বিফলতাকে চেপে রাখার জন্যই যেন গল্প করা, তাস পেটা, উলবোনা—নয়ত নীরবে বসে বই পড়া।

ভাগ্য গণনার আসরে রামদাসের অবির্ভাব একরকম অনাহুত অবাঞ্ছিত অতিথির মতো। একদিকে মণিমোহন, অপরদিকে শর্মিলা চন্দনা বিনতা জ্যোতিষ চর্চায় আকৃষ্টই হয়ে পড়েছিল। দিব্যি সময় কাটছিল কিন্তু মতলবী মণিমোহনের। বিশপবাবু কিংবা অন্য অনেক যাত্রী মণিমোহন গুণের আপাত-সন্তুষ্ট ভাগ্য গণনায় তেমন কোন রসের সন্ধান না পেলেও সময় তাদেরও বেশ কেটে যাচ্ছিল। ব্যাপার বুঝে, কিংবা একেবারেই না বুঝে কিছু রস আমদানির মতলবে রামদাস বলল—'ভক্তিমূলক গানের শেষে আজ দ্বৈতকণ্ঠে আমরা আপনাদের এক মজার গান শোনাব—বৌ আমারে বাপ ডেকেছে। গোল করবেন না। আস্তে।'

লোকাল গাড়ির যাত্রীদের মধ্যে চাপা গুঞ্জন উঠল, অনেকে নড়েচড়ে বসল, অনেকেই ভাবতে লাগল, পরের গানটি আগে হলে ভাল হয়। কিন্তু রামদাস পাকা খেলোয়ার। ইঙ্গিত পেয়ে তার দশ-টাকা-রোজের বেতনভুক গায়ক গুপীযন্ত্র বাজিয়ে ভক্তিবিগলিত কণ্ঠে গাইতে লাগল—

'রূপ যদি তোর এতই ভাল, মা,
মুণ্ডমালা কেন গলে?

দয়াময়ী নাম যদি তোর
শিব কেন তোর পদতলে ?
যার করুণা বিশ্বজোড়া
খড়্গ কেন করতলে ?'

স্বয়ং মা কালী শান্তিপুর লোকালে উপস্থিত থাকলে এই সব দুরন্ত অভিযোগের কি জবাব দিতেন কে জানে কিন্তু গানটি সবার ভালই লাগল। তা কি পার্লামেন্টারিয়ান মেজাজী ভক্ত-কবির গীত রচনার গুণ, নাকি গায়কের কবি-ভূমিকায় সঙ্গীত-নৈপুণ্য, বলা শক্ত। আশ্চর্যের কথা, সকাল বেলায় এ গান যে ভাল লাগে না এবং বুড়ো হাবড়া লোকের জন্যই যে আজ গাওয়া হয়েছে, সেই প্রমাণ করতে রামদাস উঠে পড়ে লাগল। ভর্ৎসনার সুরে বলল—'মাস্টার, গান জমল কৈ ?' সম্ভবত পূর্ব সঙ্কেতমত মাস্টার নির্বিকার যাত্রীঠাসা কামরায় যথাযোগ্য দৃষ্টি ফেলে রামদাস আবার বলল—'জানি, আপনাদের মন চায় এখন দেহতত্ত্বের গান। দুঃখু করবেন না, আমরা দুজনে মিলে এবার গাইব—বৌ আমারে বাপ ডেকেছে। না না, গোল করবেন না! আস্তে।'

রামদাস নিপুণ স্টেজ-ম্যানেজার। 'গোল করবেন না, আস্তে' তার অনুরোধ নয়, হুকুমাত-রামদাস, যা পালন না করে যেন কারও উপায় নেই! কোন গোলমাল সত্যি আর তখন ছিল না। নিজের নিজের দিকে কি করে টেবিল ঘুরিয়ে নিতে হয়, রামদাস তা জানে! দেহতত্ত্বের গীত-উৎসুক জনতা তার নিজস্ব খবরদারিতে পোষ মেনে নিয়েছে।

শ্যামা সঙ্গীতের উৎপাত শুরু হলে মণিগুণ শর্মিলার কোল থেকে দুঃখের সঙ্গে হাত সরিয়ে নিয়েছিল। তারপক্ষে বিশেষ আশ্বাসের কথা, গান শোনার বদলে আরও চেপে ঘন হয়ে বসে শর্মিলা, চন্দনা, বিনতা তার সঙ্গে গভীর আগ্রহে কথা বলছিল—কে জানে কি কথা! বোধ হয় আলাপ আলোচনায় খুশি হয়েই মণিমোহন গুণ একফাঁকে সবাইকে আপন ঠিকানাও লিখে দিয়েছিল।

দেহতত্ত্বের গান শুরু হবার প্রস্তাব শুনে শর্মিলারা এবার চোখ ঠারাঠারি করল। একান্ত নিঃশব্দে তাদের মধ্যে না-জানি-কি এক বার্তা বিনিময় হয়ে গেল। তখন এক বৃদ্ধ-যাত্রী নস্যি নিতে নিতে রামদাসকে হুকুম করল—গাইতে যখন এসেছে, তখন একবার গাও না ক্যানে? শুনে আমরা আনন্দ করি। ভদ্রলোকের সত্যি তর্ সইছিল না।

মাঠে মাঠে বোরো ধান, বাঁধা কপি, গোলবেগুণ আর ধরে না। সর্ষে গাছের হলুদ রঙের ফুল থেকে অনেক থোর বের হয়েছে। আকাশ বড় নীল—স্বচ্ছ, সুন্দর, মেঘ-মুক্ত। নির্মল-নীল হাওয়ায় খেসারি-মুশুরী সর্ষে ফুলের গন্ধ ঘন হয়ে মিশে গেছে। এমন দিনে চলন্ত গাড়ির কামরায় যদি ঘুটুম ঘুটুম করে গুপীযন্ত্র বাজে, দেহতত্ত্বের গানের আভাস মেলে, কার-না-ভালই লাগে! কিন্তু বেরসিক রামদাস গান শুরু না করে আবার শুরু করল কথা—'আমেরিকায় গিলবার্ট সাহেব বলেন, দাঁত খারাপ হলে পেট খারাপ হয়, পেটরোগ থেকে সব রোগ।'

রতন খাসনবিস রেগে গেল—'গ্যাজানি থোও এবার। দাঁত খারাপ অইলে যে হ্যানো অয়, ত্যানো হয়, হেইত্যান হগল ডাক্তারেই কয়। এহন গানডা তুমি গাও দেহি।'

রামদাসের যেন ভ্রুক্ষেপ নেই। ধনেশ পাখির হাড়চূর্ণ এবং মহানিমের ভস্ম দিয়ে তৈরী দাঁত-মাজনের কথা ঘোষণা করে সে বলল—একবারটি পরীক্ষা করে দেখুন। দেহতত্ত্বের গান শুনে আপনারা যখন হাসবেন, দাঁতগুলো ঝকঝক করবে, আর তাই-না-দেখে কেউ-না-কেউ নির্ঘাৎ প্রেমে পড়বে। এই গাড়িতেই।'

এবার সবাই হেসে উঠল। শর্মিলা এবং বিনতা মণিগুণের সঙ্গে তখনও তন্ময় হয়ে কথা বলছিল। একেবারে বোধহয় গুণমুগ্ধ হয়ে।

'আপনি আসুন, আপনি দেখুন' বলতেই এক সৌখিন যাত্রী এগিয়ে এলো। রামদাস তার হাতে মাজন ঢেলে দিয়ে বলল—

'মাজুন তো এবার।' আদেশ পালিত হতে দেখে রামদাস হাতের বোতল থেকে জল ঢেলে দিয়ে তাকে মুখ ধুয়ে নিতে হুকুম করল, তারপর আরশি এগিয়ে দিয়ে বলল—'দেখুন তো, দাঁত পরিষ্কার হয়েছে?'

লোকটি তো অবাক! পান-খাওয়া ঝামা-কালো দাগগুলো সব উঠে গিয়ে দাঁত ঝক ঝক করছে। মুখে হাসি আর তার ধরে না! চলন্ত গাড়িতে রামদাসের সে জ্যান্ত বিজ্ঞাপন!

মাজন বিক্রীর শেষে গুপীযন্ত্র বাজিয়ে রামদাস সত্যিই গাইতে লাগল—'বৌ আমারে বাপ ডেকেছে—।'

পুরো গানটি এখানে উদ্ধৃত করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।

সাত

শান্তিপুরের সুবিস্তীর্ণ অঞ্চল থেকে স্টেশনে লোক এসেছে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি-করা লোক। তারা ভদ্রেশ্বরীতলা, কুটিরপাড়া, আশানন্দপাড়া থেকে এসেছে, বৈষ্ণবপাড়া, ঢাকা-পাড়া, রাজপুত-পাড়া থেকে এসেছে—এমনকি বকুলতলা, গাইনপাড়া, কালনাঘাটও বাদ পড়ে নি। এই অঞ্চলগুলির সঙ্গে শান্তিপুর রেল-স্টেশন অগণিত সড়ক উপসড়কে যোগযুক্ত। শান্তিপুরে অনেক সড়ক, অনেক গলি —কথায় বলে কলকাতার চেয়ে সব সময়ই এক গলি বেশি!

কৃষ্ণনগর-রাণাঘাটের সুপ্রাচীন রাজপথটি শান্তিপুর স্টেশন ছুঁয়ে মতিগঞ্জ এসে একটু থেমেছে—তারপর দ্বিধা বিভক্ত হয়ে এক শাখা ডাইনে গেছে কালনাঘাটে, অপরটি বাঁয়ে রানাঘাটে। স্টেশন থেকে মতিগঞ্জ পর্যন্ত মূল সড়কের ছু'পাশে শান্তিপুরের যত সব জনপল্লী কয়েক শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইতিহাস-ঐতিহ্য-সংস্কৃতির সাক্ষী হয়ে।

মতিগঞ্জের নিচে পুণ্যতোয়া ভাগীরথী চৈতন্যযুগেও বহতা ছিলেন। জনৈক বৈষ্ণবকবি যখন 'একই গঙ্গার তিন তীরে শান্তিপুর ধাম' লিখেছিলেন, তখন তিনি দক্ষিণ শান্তিপুরে মতিগঞ্জের কাছেই গঙ্গা দেখেছিলেন, পরে পশ্চিমে কালনাঘাটের দিকে এগিয়ে গাঙপাড়া অর্থাৎ গাইনপাড়ায় উঠেছিলেন। গাইনপাড়ায় গঙ্গায় হাজামজা নদীরেখাটি না-জানি-সে-কবেকার স্মৃতি নিয়ে আজও পড়ে আছে। বর্ষার দিনে কালনা-গঙ্গার একটি কূল-প্লাবী ধারা বেলডাঙায় বেঁকে হরিনদী-সূত্রাগড় হয়ে বেরিয়ে এসে এই মরা নদীকে ফোলায়, গাইনপাড়ার পাশ দিয়ে বয়ে গিয়ে মতিগঞ্জের বিলুপ্ত নদীরেখায় মিশে যায়। আজ গঙ্গানদী শান্তিপুরের খুব কাছে নয়—মতিগঞ্জের মোড থেকে ছু মাইল দক্ষিণে। ওপারে তার গুপ্তিপাড়া। বছর

ষাটেক আগে মতিগঞ্জের অদূরে ভরা গঙ্গা দেখেই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন—'শান্তিপুরের দক্ষিণে নৌকা ভাসাইয়া গঙ্গার পশ্চিম তীরের শোভা যে দেখে নাই, বাংলার সৌন্দর্য সে দেখে নাই বলিলেই চলে'।

ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের গর্বের শেষ নেই, এই গঙ্গা-কেন্দ্রিক শান্তিপুরে তারা বসবাস করে, রোজগারের ধান্দায় বাইরে বেরোলেও শান্তিপুরকে তাদের ছেড়ে থাকতে হয় না।

বিশপবাবু বড় সড়ক ধরে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের দিকে এগোচ্ছিল এবং গাছে গাছে লক্ষ্য করে আমের বৌল দেখছিল। শীত শেষ হয়ে গিয়ে বসন্তের আবির্ভাব ঘটতে আর খুব দেরি নেই। মার্টিনবাবু নাকি তিন সপ্তাহ আগেই কলকাতায় কোকিলের ডাক শুনেছে। ইট সিমেন্টের কলকাতায় শীত ভাল করে কায়েম হতে না হতেই বসন্তের হাওয়া তার গায়ে লাগে। শান্তিপুরে শীত বেশি বলে বৌল এখনও সব গাছে ধরে নি।

স্টেশনের শিমুল গাছটি দেখলে কিন্তু মনে হয়, শান্তিপুরে বসন্ত জাগ্রত হয়ে উঠছে—কারণ গোটা কত শিমুল ফুল এরই মধ্যে ফুটে বের হয়েছে। নিষ্পত্র ডালগুলিতেও ফুলের কুঁড়ি কলা-কলা হয়ে ফুলে আছে। কচি সবুজ ফুলের কুঁড়ি। শিমুল গাছে যে পাতা নেই তা মালুমই হচ্ছে না।

স্টেশনে তখন অনেক যাত্রী এসে গিয়েছে। যারা যুগলে যুগলে তাদের সংখ্যা কম নয়। এক ভদ্রলোক তার সঙ্গিনীর সঙ্গে মশগুল হয়ে কথা বলছিলেন। বেশ মানানসই জুড়ি—সর্বতোভাবে সুশ্রী।

অযাচিত ঔদার্যে সৃষ্টিকর্তা তাদের যেন সব দিয়েছেন এবং সে কথা তারা ভালই জানেন।

স্টেশনের আলকাতরা প্রলিপ্ত নেমপ্লেট সবার চোখে রোজই হয়তো পড়ে, কিন্তু কেউই মাথা ঘামায় না। এক ভদ্রমহিলা এবং তার স্বামী শান্তিপুরের মুছে দেওয়া নাম আজ এমন করে দেখছিলেন, যেন তারা আসলে পুরাতত্ত্বের গবেষক এবং এইমাত্র কিছু বিলুপ্ত

কার্তি চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। ভদ্রলোককে দেখলে কিন্তু মনে হয় তিনি স্বামী নন, প্রেমিক—দুজনে মিলে পি-এইচ-ডি করেন, শান্তিপুর লোকালে রোজই কলকাতায় যান। স্যারের কাছে। মহিলার গায়ের রঙ কিছু কমা, দাঁত উঁচু আর ফাঁক ফাঁক, দৈর্ঘ্য স্বামীর তুলনায় কিছু বেশি। একথা যেন কিছুতেই তিনি ভুলতে পারেন না।

স্টেশনে আজ একটি বিশেষ রকমের জোড় ছিল। তারা যে স্বামী-স্ত্রী তা কারও ভুল করার কথা নয়। ভদ্রলোকের ছোট চুল। পাকা। দাড়ি পাকা। গোঁফ নেই। পরণে শাদা পাজামার শাদা কোর্তা, জহর কোট, কটকি চপ্পল আছে বলে দেহটিকে কিছু শীর্ণ দেখায়। মহিলা তার প্রায় সমবয়সী—ফরসা, মোটা, আত্মসচেতন। বুকের দিকে তাকালে মনে হওয়া অসম্ভব নয়, স্তনদুটি প্লাস্টিক সার্জারি করা। তার উপর আবার শাড়ির আঁচল কায়দায় পাট করা, যাতে বুকভরা স্তনিমার ঔদ্ধত্য সহজে চোখে পড়ে। ভদ্রমহিলা ঐখানে যেন অপস্রিয়মান যৌবনকে ধরে রাখবার জন্য বুক পেতে জরাকে ঠেকিয়ে রেখে কেবলই বলছেন—তফাত যাও। কিন্তু জরা নয়, যৌবন অনেক তফাতে হটে গিয়েছে।

তিন তিনটি যুগল যাত্রীই শান্তিপুর শহরের লোক। হরেক রকম যাত্রীর ভিড়ে তারা না থাকলে শান্তিপুর স্টেশনকে আজ যেন বিশেষ করে বিশপের চোখে পড়ত না। হলুদ রঙের রোদ তখন সারা স্টেশন আলোকিত করে একটি স্বর্ণময় প্রভাতের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। আকাশের দেবতা আজ বোধ হয় শান্তিপুরকে এই সুন্দর প্রভাতটি দান করেছেন।

তিন নম্বর প্ল্যাটফরমে তখন ছোট লাইনের ছোট গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। নবদ্বীপ ধামের গাড়ি। ছেলেবেলায় বিশপবাবু ঠাকুরমার কাছে শুনেছিল, গয়াতীর্থ সেরে রেলে এসে তিনি কালনায় নেমেছিলেন। তখন কালনাঘাট-শান্তিপুরে না ছিল পাকা সড়ক, না ছিল বাস। তীর্থমতী বৃদ্ধা মহিলা এবং সঙ্গীসাথীর দল ভীতিবহুল

পথ কষ্টের পায়ে হেঁটে শান্তিপুর তীর্থে গিয়েছিলেন, তারপর ছোটগাড়িতে নবদ্বীপ। স্টেশনের উত্তরে ঐ যে অল্প মুকুলিত আমগাছটি দেখা যাচ্ছে, কে জানে, হয়তো ঐখানে ইট-খাড়া-করা উনুনে তারা রান্না করেছিলেন—আতপচালের ভাত, সোনামুগের ডাল, বেগুন ভাজা। কিন্তু ডালে ঘি দিয়েছিলেন কি? বিশপবাবু মনে মনে তাও ভাবছিল এবং মনে মনে নিজেই তার উত্তর দিয়েছিল —নিশ্চয়ই। কারণ ঠাকুরমা তো মাঝে মাঝেই বলতেন—'ঘি ছাড়া ডাল, লক্ষ্মীছাড়া গাল একই কথা।'

খালি পা ছেঁড়া হাফপ্যাণ্ট পরা এক দরিদ্র বালক ছোট রেল লাইনের পাশে খোলা গুদোম থেকে বড় একটি কয়লার চাঁই চুরি করে নিয়ে চলে যাচ্ছিল। দৌড়ে পালাবার তার দরকারই ছিল না, কারণ চোর ধরার বালাই সেখানে নেই। তবু কিন্তু বেচারা হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল। হাঁটুতে চোট বোধ হয় কিছু বেশিই লেগেছিল। কিন্তু বিশপবাবুকে সামনে দেখতে পেয়েই তার মুখে একটু হাসি ফুটল, ভিক্ষা-চাওয়া মুখের মতো। আসলে সে কিন্তু মোটেই হাসে নি। শুধু অসহায় বিহ্বলতার ছাপ তার মুখে ফুটে উঠেছিল। বিশপবাবু আদপে যে চোর ধরা লোক নয়, সে কথা টের পেতেই হোঁচট-খাওয়া বেদনা তার মুখে গভীর হয়ে দেখা দিল। কোলের কাছে কয়লার চাঁইটি সুরক্ষিত করেই প্রথমে হাঁটুতে সে হাত বুলিয়ে নিল—তারপর চোখের নিমেষে উধাও। সঙ্গীসাথীর দল এতক্ষণ কয়লা স্তূপের ফাঁকে লুকিয়ে থেকে সবই লক্ষ্য করে দেখছিল। অবস্থা অনুকূল বুঝে চাঁই চাঁই কয়লা তুলে তারাও এবার পালিয়ে গেল। হানড্রেড থারটিন-আপ শান্তিপুর লোকাল কলকাতা থেকে এসে পড়তে আর তখন দেরি ছিল না।

কয়লা চোরদের পালাতে দেখে হরিপ্রসাদ সিং হেসে বলল— 'পালাচ্ছিস কেন, চুরি কর্—যত পারিস কয়লা চুরি করে নিয়ে পালিয়ে যা। তোদের আর ভাবনা কি? যত বেশি কয়লা চুরি হবে,

'তাও বোঝেন না?' ততোধিক অবাক হয়ে হরিপ্রসাদ জবাব দিল—'সকালে যখন চান-খাওয়া সেরে ঘর থেকে বেরোই, ছেলে তখন শুয়ে ঘুমায়। রাতে যখন ফিরি, তখনও সে বিছানায়। খাড়া দেখলে তো দেখাতে পারি?'

ছেলের দৈর্ঘ্য বোঝাবার রকম দেখে বিশপবাবু তো অবাক। বৌয়ের বুকে মাথা রেখে বেলা আটটা-সাড়ে আটটা পর্যন্ত পড়ে থাকা চলে না, হয়তো চর্বচোষ্যলেহ্যপেয় মুখে তোলাও তার ঘটে না, কারণ আপিস-গাড়ি ধরা চাই। কত ধকল, কত তার প্রস্তুতি। শান্তিপুর-কলকাতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করাই তো পৃথক একটি কাজ—বাড়ি থেকে গাড়ি, গাড়ি থেকে আপিস, তারপর জগন্নাথদেবের উল্টোরথ যাত্রা—এতে করে সাত-আট ঘণ্টা সময় কি আর নষ্ট না হয়? তা হোক, কিন্তু রবিবার? রবিবারেও হরিপ্রসাদের অনেক কাজ. বৌয়ের ফাই-ফরমাজের কি আর অন্ত আছে? আপত্তি করলে বৌ মিষ্টি করে অনেক কথা শুনিয়ে দেয়—'বারে, এটা যদি করতেই পারবে না, সেটা যদি দিতেই পারবে না, ওখানে যদি যেতেই পারবে না, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হয়েছিল কেন?' হরিপ্রসাদ বিগলিত হয়। এমন পুরুষের মতো পুরুষের সঙ্গে বিয়ে হলে স্ত্রীর কোন ঐহিক বাসনাই যে অপূর্ণ থাকবে না, সেটি জেনেশুনেই যেন চম্পাবতীর বাবা বিয়ের সম্বন্ধ করেছিলেন। নিজের সাধ-আহ্লাদ মিটুক আর না মিটুক, স্ত্রীর তাবৎ ইচ্ছা পূর্ণ করার পক্ষে তার মতো পুরুষই যে ভরসাস্থল। হরিপ্রসাদ সিং তা সত্যি বিশ্বাস করে—বিশ্বাস করতে তার ভাল লাগে। এবং স্ত্রীর ফাই-ফরমাজ খাটতেও।

হাণ্ড্রেড-থারটিন-আপ শান্তিপুর স্টেশনে ভিড়তেই সে কি হুড়োহুড়ি। একেবারে গোড়া থেকে গাড়ি ছাড়ছে, তবু কেন এমন হয়? খুশিমতো যে-সে কামরায় উঠলেও তো বসবার জায়গার অভাব হবার কথা নয়। কিন্তু বসবার জায়গাই তো বড় কথা নয়—প্রথম থেকে দুই বা তিন নম্বর কামরা হওয়া চাই, জানলার কাছে সিট

চাই; শীতে শান্তিপুর-মুখো, গরমে কলকাতার দিকে মুখ করে যাওয়া চাই। শীতের দিনে কে হাওয়া চায় মুখে, গ্রীষ্মেই তা কে না চায়? সব যেন সাহেব লোক!—বিলেত থেকে পরিবার-পরিজন নিয়ে ইণ্ডিয়ায় আসছে। জাহাজে। ডাইনে মরুভূমির দেশ মিশর। হাওয়া তার গরম। সাহেবরা সইতে পারে? সুতরাং তাদের জন্য মনোরম ব্যবস্থা চালু হল—পোর্ট আউটওয়ার্ড, স্টারবোর্ড হোমওয়ার্ড অর্থাৎ বহির্যাত্রায় বাঁয়ে, প্রত্যাবর্তনে ডান দিকে তাদের থাকার স্থান। আর সেই থেকে উদ্ভব হল একটি শব্দ—'পশ', পোর্ট-আউটওয়ার্ড-স্টারবোর্ড-হোমওয়ার্ড শব্দগুলোর প্রথম অক্ষর নিয়ে। শান্তিপুর লোকালে হরিপ্রসাদ গিরিজা গোঁসাইরা দুই নম্বর বগীতে 'পশ' কামরা সৃষ্টি না করে ছাড়ে নি।

হরিপ্রসাদ ঠেলেঠুলে গাড়িতে উঠেই একটি কাজ করল—তিনটি আসনে রুমাল, নবকল্লোল, টিফিনের কৌটো রেখে ন্যায্য দখল প্রতিষ্ঠিত করল—এ যেন নীলামের জমি সস্তায় কিনে বাঁশের আগায় লাল পতাকা উড়িয়ে দেওয়া। জুত করে নিজের আসনে বসে হরিপ্রসাদ একটি বিড়ি ধরাতেও ভুলল না। এবার যেন নিশ্চিন্ত।

অসীম প্রামাণিক, গিরিজা গোঁসাই, সুধীন কর হরিপ্রসাদের সংরক্ষিত আসনে বসে পড়েছিল। কিন্তু একটি কাজ তখনও বাকি আছে—একরকম নিত্যকর্ম। কাগজ কেনা। চারজনের ভাগের কাগজ। এক কপি আনন্দবাজার কিনে কামরার বাইরে নিজের সিট বরাবর জানালার ধারে দাঁড়িয়ে হরিপ্রসাদ কাগজ পড়তে লাগল। এটি তার চিরদিনের অভ্যেস। শান্তিপুরের সকালে সদ্য কাগজ এসেছে—বাড়ির দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে একবারটি না পড়লেই নয়। সারাদিনের স্বল্প অবসরে কাগজ পড়বার এই তার একমাত্র অবকাশ, এই তার শেষ কাগজ-পড়া। অল্প-খোরাক লোকের খাওয়ার মতো—না খেলে নয়, তাই যেন খায়।

'আজকের গাড়িটা বেশ ভাল মাইরি। ফিটফাট। জানালাগুলোও কাচের। এমনটি রোজ পেলে বেশ হয়—শালা মনমেজাজ

চাঙ্গা হয়ে ওঠে'—এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখে নিজের আসনে বসতে বসতে হরিপ্রসাদ ঘোষণা করল; তারপর বড় একটি ঢেকুর তুলল। ভালমন্দ খেয়ে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা যেন কতই সুখের।

গাড়ি-চড়ার ডামাডোলে আলাপের যে ছেদ ঘটেছিল তার জের টেনে বিশপবাবু বলল—'আমার একটি প্রশ্ন আছে: রোজ ভোরে ঢেকুর-তোলা খাবার রাঁধতে গিন্নীর কষ্ট হয় না?'

আহত কণ্ঠে হরিপ্রসাদ জবাব দিল—'অবাক করলেন মশাই! বাঙালী ঘরের বৌ, তাও আবার শান্তিপুরের মেয়ে—স্বামীকে না খাইয়ে সারাদিনের মতো ছেড়ে দিতে পারে, না কি কোন স্ত্রী তা পছন্দ করে?'

গিরিজা গোঁসাই দারুণ ফোঁড়ন কাটল—'আরে তুদ্দুর, স্বামীকে রেঁধে খাওয়াবার জন্য ওঠে, নাকি তুই বৌদির পাছায় গুঁতো মেরে উঠিয়ে দিয়ে বলিস—ওঠ্ যা, আপিসের ভাত রাঁধ্‌গে।'

এমন সুন্দর সকালে তার নিজ হাতে জায়গা-রাখা আসনের দখলদার গিরিজা এমন অভব্য কথা এতো শীগগীর যে বলবে, হরিপ্রসাদ তা আশা করে নি। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সে বলল—'কেন, তোর বৌ কি রোজ হাঁড়িকুঁড়ি উপুর করে ফেলে ঘাড় ধরে তোকে খালিপেটে আপিসে পাঠিয়ে দেয় নাকি?'

'তা কেন হবে' গিরিজা শঙ্কর গোস্বামী হা হা করে উঠল—'আমরা স্ত্রীকে স্ত্রীর মতোই দেখি, জানোয়ারের মতো নয়। ধীরেসুস্থে ঘুম থেকে উঠে মুখ হাত ধুয়ে বৌ চা করে—ডিম সেদ্ধ আর টোস্টের সঙ্গে জমে ভাল। খাবার মুখে দাও, চা খাও, গল্প কর। তারপর পোশাক পরে তৈরী হয়ে নাও। আপিসের পোশাক।' আধুনিক শান্তিপুরে তার প্রাতরাশের ব্যবস্থা যে কত সভ্যভব্যভদ্র তাই ব্যাখ্যা করতে গিরিজা গোঁসাই বলল—'ভোর সকালে এক থালা ভাত? ওসব মধ্যযুগে চলত! আসল ব্যাপার কি জানিস? পয়সা খরচা করা চাই—আর চাই রুচি।'

হরিপ্রসাদের এবার না চটে উপায় ছিল না। সত্যি সত্যি যেন

ঝগড়া করা হচ্ছে, তাকে হেয় করার চেষ্টা চলছে। রাগতভাবে সে বলল—'ভারি তো এক-ডিম সেদ্ধ, দু'পিস-টোস্ট। ভোর সকালে স্টোভ জ্বেলে ভাত, ডিমের কারি, কপির ডানলা রাঁধতে তোদের চাইতে ঢের বেশি খরচা হয়, বুঝলি ?'

'পয়সা আমাদেরও খরচা হয়', গিরিজা গোঁসাই বলল—তোদের অন্তত ডবল। দুপুরের খাবার আমরা কিনে খাই। ক্যানটিনে।'

হালকা সুর কেটে গিয়ে ক্রমে অবাঞ্ছিত উ ওতার সৃষ্টি হচ্ছে দেখে বিশপবাবু রাজনীতির প্রসঙ্গ তুলে বলল—'আপনাদের নিকুঞ্জবাবু ছাড়া পেয়েছেন কি ?'

প্রশ্নটি কার উদ্দেশে করা হয়েছে তা না জেনেও হরিপ্রসাদ ভাবল, জবাব দেবার দায়িত্ব একমাত্র তারই। ক্ষণকাল আগের ক্ষুণ্ণ সম্মানবোধ তার মনেই রইল না। সরাসরি উত্তর না দিয়ে হরিপ্রসাদ বলল—'কৈ, এখনও তো বোমা-পটকা কিছু ফাটে নি মশাই।'

হরিপ্রসাদ হাসছিল। পান-খাওয়া গোড়ায়-কালো দাঁতগুলো তার ঝকঝক করছিল। এমন দাঁতের যে আবার একটি সৌন্দর্য আছে, বিশপবাবু আগে তা কখনও খেয়ালই করেন নি। তার দাঁতের দিকে বিশপবাবুকে তাকিয়ে থাকতে দেখে হরিপ্রসাদ বলল —'বোমা ফাটার অর্থ বুঝতে পারেন নি তো ! নিকুঞ্জবাবু ছাড়া পেলে তার চেলা-চামুণ্ডারা মিছিল বের করত, বোমা পটকা-ফাটিয়ে আনন্দ করত। ঠিক কিনা বলুন ?'

বিশপবাবু অবশ্য দ্বিমত হল না। নিকুঞ্জবাবুকে জেলে পুরে দিতে পেরে তার বিপক্ষদলও তাই করেছিল। এটি আধুনিক রেওয়াজ। পলিটিক্যাল স্টাইল !

হরিপ্রসাদের তৃতীয়বার ঢেকুর তোলা হয়ে গেছে। এবং ব্যাপারটি গিরিজা গোঁসাইর নজর এড়ায় নি। তাতে যেন হরিপ্রসাদ সিদ্ধির উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়েছে। তাই বোধহয় এবার সে বলল—'আজ খুব বেড়ে খাওয়া হয়েছে মাইরি। কি খেয়েছি জান ? শিম-বেগুন-সজনে ফুলে চচ্চরি। বরি দিয়ে রান্না। কি সোয়াদ!

বৌ দিয়েছিল বটে—এ্যাতোটা! পাঁচ আঙুলের গোলাকৃতি মুদ্রায় হরিপ্রসাদ সুস্বাদু চচ্চরির পরিমাণ দেখাল। আলাপ আলোচনা আবার খোঁচাখুঁচিতে মোড় নেবার নিশ্চিত লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে উঠল।

গিরিজা গোঁসাই কিন্তু সজনে ফুলের চচ্চরির কথাটি ভুলতে পারছিল না। এবারের মরশুমে এমন অমৃত তার পাতে এখনও পড়ে নি। দোষটা নেহাত তার নিজের। আনি-আনছি করতে করতে শীত চলে যাবার মুখে, অথচ শান্তিপুরে সজনে ফুলের অন্ত নেই। 'গোঁসাই তাঁতী সজনে ফুল, এই তিনে শান্তিপুর' তো প্রবাদ বাক্য। হরিপ্রসাদ আগে চচ্চরি খেয়ে ঢেকুর তুলছে—এ যেন তার কাছে গিরিজা শঙ্কর গোস্বামীর আপন পরাজয়।

কৃষ্ণনগর, রাণাঘাট, পায়রাডাঙার লোকও যে সজনে ফুলে শিমবেগুনে চচ্চরি-ভাত না খায় তা নয়, কিন্তু তা বোধহয় লাউঘণ্ট ঝিঙে-পোস্ত বেগুন-পোড়ার মতোই মামুলি অন্ন-ব্যঞ্জন। অথচ গিরিজা গোঁসাইদের কাছে তা শান্তিপুরের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ব্যঞ্জনা, তার রাজাসিক মিষ্টান্ন রসকদম্ব, নিখুঁতি, পানতুয়ার মতো। গিরিজা গোঁসাই যেন সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের ধারক নয়, বাহক নয় কারণ এবার সে এখনও চচ্চরি চাখে নি!

হার মানতে অনভ্যস্ত গিরিজা গোঁসাই বলল—'রোববার দিন যা ক্যাঁকড়া খেলাম না, অপূর্ব!' চোখ দুটি তার আধবোজা হয়ে এলো—যেন কঁ্যাকড়ার স্বাদ তখনও মুখে লেগে আছে। তারপর সেই অপূর্ব স্বাদের কঁ্যাকড়া রন্ধন-প্রণালীর আভাস দিয়ে সে বলল—'বেশি করতে হবে না! গরম জলের কড়ায় জ্যান্ত ক্যাঁকড়া ছেড়ে দাও। দুমিনিট—মোটে দু'মিনিট। ব্যস। ঘি গুলো শুধু জমে যাবে। তারপর কেটেকুটে রাঁধো। গরম মশল্লা দিয়ে নামিয়ে নাও।'

গিরিজা গোঁসাইর যে কুলে জন্ম, সেই পরমপূজ্য গোস্বামী বংশে অদ্বৈত মহাপ্রভু জন্ম নিয়েছিলেন। স্বয়ং চৈতন্য মহাপ্রভু শান্তিপুরে

মাঘের হিমানীতে বাঘের শরীর কাঁপলেও হিম তার দেহে কখনই অনুপ্রবেশ করতে পারে না। মাঙ্কি ক্যাপ থেকে মুখ বের করে রবীন কুণ্ডু বললেন—পরের কাঁধে বন্দুক রেখে খুব তো ঘোড়া টেপা হচ্ছে বাবুসকল। বেশ কথা, গিরিজার স্ত্রী ক্যাঁকড়া রেঁধে তোমাদের খাওয়াবে। কিন্তু বড় সাইজের ডজন খানেক ক্যাঁকড়া, এক হাঁড়ি দৈ, আর কিলোখানেক কড়া ঝাঁঝের পেঁয়াজ সঙ্গে নিয়ে আসছো তো?'

একি আমন্ত্রণ, নাকি পরিহাস! অসীম প্রামাণিক ভাবতে লাগল, কি জবাব দেওয়া যায়। গিরিজাশঙ্কর গোস্বামীর কিন্তু জীবনে [illegible] মনে, হল রবীন [illegible] তো লোক হয় না!

আট

—শান্তিপুরবাসী যতো তন্তুবায়গণ
আইলা প্রভুগৃহে করিতে কীর্তন—

চৈতন্যযুগের কথা। হরিনামের বন্যায় শান্তিপুর ডুবিয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তখন সন্ন্যাস নিয়েছেন। বিচ্ছেদের বিপুলতায় সবচেয়ে বেশি আঘাত পেয়েছেন তন্তুবায়গণ, যাদের বেশির ভাগ ছিলেন চৈতন্যদেবের সাক্ষাৎ-শিষ্য।

আঘাতের প্রথম চোট কেটে যেতেই সরলপ্রাণ ধর্মভীরু চৈতন্যশিষ্যরা শুরু করলেন নামকীর্তন—শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীচৈতন্যের নামে। প্রভুগৃহে। এই 'প্রভু' শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য, আজকের ডেইলি প্যাসেঞ্জার গিরিজাশঙ্করের আদিকুলপুরুষ। গিরিজা গোঁসাই ধন্য। ধন্য অসীম প্রামাণিকও, কারণ তার ধমনীতে আজও বইছে চৈতন্যভক্ত তন্তুবায়গণের অন্যতম হরিহর প্রামাণিকের রক্তধারা।

দিনের পর দিন, বছরের পর বছর, শতাব্দীর পর শতাব্দী শান্তিপুরবাসীরা নামগান করেছেন—দৈন্যের দুর্দিনে, সম্পদের সুদিনে। সাড়ে চারশ বছরেও সে-নামের মহিমা ক্ষুণ্ণ হয় নি। কিন্তু শুধু কৃষ্ণনাম, চৈতন্যনাম নিয়েই তো আর শান্তিপুর নয়—তার অনেক ইতিহাস, অনেক পতন-অভ্যুদয়-উত্থানের ইতিহাস আছে।

শান্তিপুরের দক্ষিণপূবে বখতিয়ার খিলিজি যেখানে গঙ্গাপার হয়েছিলেন এবং যে স্থানে ঘোড়া রেখে বিশ্রাম নিয়েছিলেন, বিগত আটশ' বছর পর আজও লোকে সেই দুর্ভাগ্যের স্মৃতিবিজড়িত স্থান দুটোকে বলে বখতারঘাট ... ঘো
কলঙ্কিত অধ্যায়কে বাধ্য হয়ে
মাত্র দু'মাইল দূরে বসে একদিন ...

পাতে রামায়ণগান লিখেছিলেন। কিন্তু খিলজি-আক্রমণদিনের শান্তিপুরে আর কোথায় গোঁসাই, কোথায় তাঁতী। বখতিয়ারের অন্তত দুইশ বছর পর অসীম প্রামাণিকের তাবৎ জাত-গোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের শ্রীহট্ট ছেড়ে শান্তিপুরে এসেছিলেন।

ভগবান চৈতন্যের পর দুইশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে গেল। শান্তিপুরের মাটিতে তখন কার্পাস গাছের অন্ত নেই—সুতরাং ঘরে ঘরে চরকা চলছে, চরকা-কাটা সুতোয় মসৃণমিহি কাপড় তৈরী হচ্ছে। এন্তার কাপড় রপ্তানী হচ্ছে কাবুল, ইরাণ, তুরাণে—সুদূর রোম-গ্রীস-মিশরে। শান্তিপুরের সমৃদ্ধি-সঙ্গতি আর ধরে না। দিল্লীর মসনদে মোগল বাদশারা বসে শান্তিপুরের সঙ্গে তখন সাক্ষাৎ-সম্পর্ক গড়ে তুলছিলেন। আকবর বাদশা সেনানিবাস তৈরী করিয়েছিলেন সূত্রাগড়ে। আজও শান্তিপুরের তোপখানা, সূত্রাগড়, সাড়াগড়ে মোগল দুর্গের ভগ্নস্তূপ ইতিহাসের সাক্ষীর মতো দাঁড়িয়ে আছে।

শুধুই কি আর মসৃণ-মিহি তাঁত কাপড়? আরও আশ্চর্য এক বস্তু তখন শান্তিপুরে তৈরী হচ্ছিল—চিনি। খেজুর গাছের রস থেকে। স্বাদে-সৌগন্ধে অতুলনীয় সেই খেজুর চিনি আসলে শান্তিপুরী ময়রা লোকদের আপন কীর্তি। নিকটবর্তী হরিনদী বন্দর দিয়ে তাঁত-কাপড়ের মতো বছরে দেড়-দুলাখ মন খেজুর-চিনিও তখন বিদেশে চালান হচ্ছে। তাঁতী-ময়রাদের তৎপরতায় শান্তিপুরের সম্পদ-সৌভাগ্য তখন তুঙ্গে উঠেছে।

আয়বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শান্তিপুরবাসীদের খরচ বাড়ল নানা খাতে—বিশেষ করে খাদ্যাখাদ্যে, পোশাকে, বিলাসে। সমাজ জীবনে প্রায় বিপ্লব ঘটে গেল—নতুন অভিজাত্য বোধ, লোকরুচি, সংস্কৃতি-চিন্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে অন্তরের অভিমানের মতো হুহু করে বেড়ে গেল। আয়বৃদ্ধি হলে কে দুটি আর ভাল না খায়, ভাল না পরে! কিন্তু ভারিমাপের বিপ্লব ঘটালেন বোধ হয় ময়রা লোকেরা—পানতুয়া, মনোহরা, নিখুঁতি তৈরী করে মিষ্টান্ন জগতে

তারা যুগান্তর আনলেন। পণ্ডিতদের ধারণা, শান্তিপুরের ভাষা যে এতো মিষ্টি, তার মূলে আছে খেজুর চিনিপক্ক মিষ্টান্ন।

তখন ১৭২৬ সাল এসে গেছে। শ্যামচাঁদের মন্দির তৈরী করতে তন্তুবায় সম্প্রদায়ের রামগোপাল খাঁ চৌধুরী লক্ষাধিক টাকা ব্যয় করেছেন। শান্তিপুর তখন জমজমাট। এর এগারো বছর পর কলকাতায় নিদারুণ ভূমিকম্প ঘটলে তিনলাখ লোক মরল, উপসাগরীয় ঝড়ে লাখ খানেক নৌকাডুবি হল—শান্তিপুরের গায়ে আঁচড়টিও লাগল না। তার বাবলায়, তার হরিনদীর ঘাটে তখনও তাঁতের কাপড় আর খেজুর চিনি জাহাজ বোঝাই হচ্ছে। তবে বাংলার মাটিতে ইংরেজ তখন খুঁটি গেড়েছে, কলকাতা-সূতানটি-গোবিন্দপুর মিলে বড় শহর পত্তন হয়ে গেছে। বণিকী শহর। এবং সবচেয়ে বড় কথা, শন্তিপুরেও ইংরেজের পদধূলি পড়ে গেছে। তখনও শান্তিপুরে তাঁত-বুনে-খাওয়া লোকদের সংখ্যা কমপক্ষে দশহাজার।

শান্তিপুরে ইংরেজ-কুঠি উঠেছে। পাইক বরকন্দাজ ঠিকাদারদের নিয়ে শান্তিপুর তখন সরগরম। কুঠিতে কুঠিতে কাপড় তৈরী বাদেও বছরে পনেরো লাখ টাকার তাঁত-কাপড় স্থানীয় তাঁতীদের কাছে কিনে ইংরেজ অচিরে চালানী কাজ শুরু করল। এরই মধ্যে পলাশীর মাঠে একদিন ১৭৫৭ সাল এলো আর চলে গেল। তাঁতীরা তখনও রক্তজল করে কাজ করছে। সর্বনাশের আর তাদের দেরি নেই।

ইংরেজ তখন দেশের রাজা, শান্তিপুর তাদের হাতের মুঠোয়। অদ্বৈত পাটের অদূর বাবলায় গঙ্গার ঘাটে জেটি তৈরী হয়েছে, জেটিবদ্ধ জাহাজে চালানী কাপড় উঠছে—স্থানীয় তাঁতীদের ঘরে তৈরী কাপড়, ইংরেজের গায়ের জোরে শতকরা চল্লিশ টাকা কম দামে কেনা। সদ্য রাজা হওয়া ইংরেজের স্বৈরাচারে অতিষ্ঠ হয়ে শান্তিপুরের তন্তুবায়গণ একদিন ক্ষেপে উঠলেন, আর ইংরেজ প্রতিশোধ নিতেও দ্বিধা করল না—তাঁতীদের তারা তাঁতনাশ

করল এবং বুড়ো আঙুল কেটে করে-খাবার পথ দিল তাদের বন্ধ করে।

আজও কিন্তু বাবলার অনতিদূরে ইংরেজ কুঠিবাড়ির ধ্বংসাবশেষ লোকে অবাক হয়ে দেখে, বিলুপ্ত গঙ্গার গর্ভ খনন করে কাষ্ঠপোড়ের তক্তা পায়। মাণিকের জন্য মন তাদের উন্মনা হয়ে যায়। শুধু শান্তিপুরে যারা তীর্থ করতে আসে, তারা এ নিয়ে কখনও মাথা ঘামায় না—রেল-স্টেশন থেকে আধমাইল হেঁটে তারা বাবলায় যায়। বাবলা অদ্বৈত প্রভুর ভজন স্থান।

ভোজবাজির মতো কোথায় যেন একদিন মিলিয়ে গেল সম্পদসৌষ্ঠববৈভবের শান্তিপুর। উত্তরপূবে বাবলার গঙ্গা ঘোড়ালিয়ার দক্ষিণে নেমে গেলেন। যে হরিনদী গ্রাম থেকে নৌকো বেয়ে কালনায় গিয়ে চৈতন্যদেব গৌরীদাস পণ্ডিতকে বৈঠা উপহার দিয়েছিলেন, পশ্চিম-শান্তিপুরের সে-গঙ্গাও হেজেমজে হটে গেলেন। ঠিক তখন টেম্‌স্‌নদীর ম্যাঞ্চেস্টার মাথা তুলেছে—কলে তৈরী বিলেতি কাপড় সাগরপারে চালানের অপেক্ষায় দিন গুনছে। ভারত সাগর পারে। কলের সঙ্গে কি আর পাল্লা দিতে পারে শান্তিপুরের তাঁত-বোনা বি-কল লোক, বিশেষ করে রাজা যদি গজব করে, আর ব্যাজার চোখে ছ্যাখে?

কিন্তু এ তো সর্বনাশের সবে সূচনা। বিলেতি কাপড়ের পর জাহাজ ভরে একদিন সস্তা দামের চিনি এলো। জাভা থেকে। শান্তিপুরের চিনির কারবারে শুরু হল নাভিশ্বাস। শান্তিপুর-দুর্ভাগ্যের এখানেই শেষ নয়, ১৮৭০ সালে মহকুমা উঠে গেল রাণাঘাটে, সর্বনাশের শেষ আঘাতের মতো। বহুসমৃদ্ধ যে তন্তুবায়রা একদিন খোসা ছাড়িয়ে পানতুয়া খেতেন, তাদের ঐশ্বর্যে ঘাটতি পড়ল। গোঁসাই প্রভুদের মহিমাও কমতে লাগল। আনন্দ-উৎসব-জাঁকজমক কুণ্ঠিত হল। বেড়ে চলল শুধু রাসের খরচ, ব্যভিচার, কুসংস্কার। আর ঠিক তখন জ্ঞানীরা গুণীরা ধনীরা লুপ্ত গৌরব উদ্ধার করার চেষ্টা না করে শান্তিপুর ছেড়ে পালিয়ে

গিয়ে ছড়িয়ে পড়লেন সারা ভারতে। সাত হাজার শান্তিপুরী লোক তো বাসা বাঁধলেন একমাত্র লখনউ শহরেই। ঘরে তাদের ঘুঘু চড়ল, সদরে-অন্দরে-আঙিনায় লোকে ঘুঁটে দিল। আজও সেই সব ঘরদোরের ভগ্নজীর্ণ কঙ্কালের মধ্যে অপরূপ শিল্পসৌকর্য আবিষ্কার করা যায়, ভাঙা ইটের পঞ্জরে পঞ্জরে তু'শ'-আড়াইশ বছরের পরমায়ু গোনা যায়। কিন্তু সেখানে কি সহজে আজ ঢোকবার পথ আছে?—শিশু-সেগুন-জারুল গাছ মহানন্দে মাথা তুলেছে, হোগলা-বিষকাঁটালী-বনতুলসী রাজ্য বিস্তার করেছে।

পতনের শেষ অধ্যায়ে শান্তিপুরে একদিন রেলগাড়ি এলো। লোক হন্যে হয়ে ছুটল কলকাতায়। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে। গোঁসাই-তাঁতী-ময়রা, চাকুরে-ব্যবসায়ী-পড়ুয়া, ধনী-গরিব-মধ্যবিত্ত —কেউই আর বাকি রইল না। তাদের যাত্রা হল শুরু। নতুন যাত্রা। গিরিজা গোঁসাই, হারাণ বঙ্গ, অসীম প্রামাণিক এবং অমিতা-চন্দনা-বিনতারা আসলে সেই ক্ষয়িষ্ণু শান্তিপুরের ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের চিরকেলে প্রতিনিধি।

বৈশাম্পায়ন বটব্যাল ওরফে বিশপবাবু একরকম উড়ে এসেই শান্তিপুরে জুড়ে বসেছিল। হঠাৎ কি ভেবে একদিন সে শান্তিপুরের গৌরবময় অতীতের পথ-সন্ধানে বেরিয়ে পড়ল—বাবলা থেকে ঘোড়ালিয়ায় ঘুরল, মজা গঙ্গার খাদ পর্যবেক্ষণ করল, ফুলিয়া-বেজপাড়া-মতিগঞ্জ, বাবলা-হরিনদী-সূত্রাগড় পরিক্রমা করে শেষপর্যন্ত বাসা নিল আশানন্দ পাড়ায়। তারপর একদিন সে নিজে শান্তিপুর স্টেশনে গিয়ে থ্রি হাণ্ড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুর লোক্যালে উঠে ছুটল কলকাতায়। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে!

স্টেশনে যাবার আগে আজ ভোরে বিশপবাবু মতিগঞ্জের মোড়ে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। বিধুদার চায়ের দোকানে তখনও ভিড় লেগে আছে। কুড়ি পয়সায় ঘুঘনী আর দশ পয়সায় ডবল-হাফ চা খাবার ভিড়। আগ-রাতেই বাচ্চা-কর্মচারি তু'জন সব যোগাড়

যত্ন করে রাখে—পেঁয়াজ কুচায়, আলু কাটে, মশল্লা বাটে। আদা, লঙ্কা, পাটনাই মটর—সব কিছুই হাতের কাছে রেখে দেয়। মাথায় গামছা বেঁধে দোকান-মালিক বিধুভূষণ মণ্ডল রাত তিনটে নাগাদ উনুনে হাঁড়ি চাপায়, ঘুঘনী করে। সবাই অবাক হয়ে ভাবে, মাত্তর তিরিশ পয়সায় কি করে সে চা-ঘুঘনী খাওয়ায়। কেউ কেউ কিন্তু যথাযোগ্য মন্তব্য প্রকাশ করে বলে—বিনা লাভে কেউ তুলোও তুলে নেয় না!

বিশপবাবু চা খেতে খেতে কত কিছুই ভাবছিল। কাছেই আঁতাবুনে গোস্বামীপাড়ায় বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর বাড়ি। ভোর সকালে প্রথম কাপ চায়ে চুমুক দিতে দিতে প্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণের কথা মনে ওঠা খুব স্বাভাবিক নয়। তবু উঠেছিল। বোধ হয় এতো কাছে তাঁব বাড়ি বলে।

তন্তুবায়দের ঐশ্বর্যের দিন আর তখন নেই। নেহাত গ্রাসাচ্ছাদনের জন্যই গরিবরা গলদঘর্ম হয়ে তাঁত বুনছে। একদিন হাসতে হাসতে বিজয়কৃষ্ণ বললেন—'তাঁতী, তাঁত বুনতে মন, দুটো কেষ্ট কথা শোন্।' কথাটি মনে পড়তেই বিশপবাবু আপন মনে তর্ক শুরু করল—অদ্বৈত প্রভুর সঙ্গে যারা একদিন কীর্তনের আবেশে নৃত্য করতেন, তারা যে তাঁতীই, বিজয়কৃষ্ণ তাকি ভুলে গিয়েছিলেন, নাকি তাঁতীরাই ভুলেছিলেন? তবে? তবে কেন এই উপদেশ?

গজ দশেক দক্ষিণে এগিয়ে বিশপবাবু এবার পুলের উপর দাঁড়িয়ে পড়ল। পুলের শেষে রাস্তাটি চলে গিয়েছে গুপ্তিপাড়া ঘাটের দিকে! আর নিচে সুপ্রাচীন গঙ্গার হাজামজা খাদে বিস্তর জল জমে আছে। এই দিকেরই কোন্ এক ঘাটে একদিন সতীদাহ হত। শান্তিপুরের শেষ সতীদাহ কবে হয়েছিল? বিশপবাবু মনে মনে হিসাব করল—হ্যাঁ, দেড়শ বছরই বটে। ছেলের হাত ধরে মা এসেছেন স্বামীর চিতায় সহমৃতা হতে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মহিলা জ্বলন্ত আগুনে ঝাঁপ দিতে দারুণ ভয় পেলেন; ভয় পেয়েই সে কি দৌড়। ছেলে তখন ছুটে গিয়ে মাকে ধরে ফেলল,

বাঁশ-পেটা করে আধমরা করল, তারপর টেনে হিঁচড়ে এনে চিতায় তুলে দিল। নিজের পেটের ছেলে! সহমৃতা না হলে মায়ের যে অসতী নাম রটবে—অসতী মায়ের ছেলে হয়ে কি আর সমাজে মুখ দেখানো যায়! বণিক ইংরেজ শান্তিপুরের যতো ক্ষতিই করুক, কুয়াসাঘন শান্তিপুর—সকালে বিশপবাবু লর্ড বেন্টিঙ্ককে নমস্কার না জানিয়ে পারল না।

কিন্তু কবি নবীন সেনই কি শান্তিপুরের জন্য কম করেছেন? রাসের দিনে সে কি উৎকট উল্লাস। দুনিয়ার লোক ভেঙে পড়েছে শান্তিপুরে। ভাঙা রাসের মিছিল চলছে, বেসামাল মিছিলে শেষপর্যন্ত দাঙ্গা শুরু হল। কবি তখন রাণাঘাটের এস-ডি-ও। বোধ হয় তখনই তিনি লিখেছিলেন—

কার্তিকে এদেশে হয় কালীর প্রতিমা
দেখিবে আত্মার মূর্তি অনন্ত মহিমা
ক্রমে ক্রমে হইবে হিমের প্রকাশ
সে দেশেতে কি রস আছে,
এদেশেতে রাস।

শান্তিপুরের রাস কবি-ডেপুটিকে বড়ই হিমসিম খাইয়েছিল। রাসের শান্তিপুরকে সামাল দিতে তিনি রাণাঘাট ছেড়ে চলে আসতেন, অলিগলিতে পুলিস মোতায়েন করে নিজে ঘোড়ায় চড়ে শহর টহল দিতেন। শেষপর্যন্ত দাঁড়াতেন এসে মতিগঞ্জে। এই সেই মতিগঞ্জ—এস-ডি-ও কবির খবরদারির পঁচাশী বছর পর অনেক পাল্টে গেছে।

মতিগঞ্জ থেকে হাঁটা-পায়ে এগিয়ে এসে বিশপবাবু নেতাজীর মূর্তির সামনে একটু দাঁড়াল। উল্টোদিকে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কের নতুন অট্টালিকা। তার পাস দিয়ে একটি ছোট সড়ক বাঁক নিতে নিতে সরু হয়ে বড় বাজারের দিকে চলে গিয়েছে। বিনতা নন্দীর ঘর এই বঙ্কিম সড়ক থেকে খুব দূরে নয়। বিনতাও রোজ নেতাজীর মূর্তির নিকট দিয়ে হেঁটে গিয়ে ডাকঘরের মোড়ে বাসে উঠে,

স্টেশনে যায়। আজ বিশপবাবুর মনে বড় একটি আশা ছিল—পথের মাঝে বিনতার সঙ্গে মুখোমুখি একবারটি দেখা হবে। আর তখন যেচে দু একটি কথা বলতে আর দোষ কোথায়? সুরূপা বিনতা সম্বন্ধে তার কৌতূহলটি আজকাল কিছু বেশি, অথচ চলন্ত ট্রেণের কামরায় তেমন আলাপ আর হয় কোথায়? আশ্চর্য, দুজনে একই শহরে থাকে। কিন্তু বিনতা নন্দী আজ এলো কোথায়? প্রতীক্ষা তার ব্যর্থ হল।

স্টেশন অঞ্চলে কুয়াসা আজ কিছু বেশিই পড়েছে। গোলাপখাস হিমসাগর ল্যাংড়া আমের বোল হয়তো নষ্ট হয়ে পড়ে যাবে। সজনে ফুল ঝরে ঝরে গাছতলা ফুলময় হয়ে গেছে, ঝরাফুলের জাপানে চেরিবনতলের মতো। শান্তিপুর লোক্যাল আজ অনেক লেট। করমচাপুর, কুতুবপুর, বাগ-আঁচড়া, বাবলা, হিজুলী, ভোলাডাঙা এবং গয়েশপুরের মাঠ থেকে বিশুর টম্যাটো এসেছে। শীতশেষের টম্যাটো। ট্রেন না এলে তার যে কি গতি হবে কে জানে।

দোস্ত মহম্মদ কিন্তু ট্রেন লেটের জন্য মোটেই ভাবিত নয়। বিশপবাবু শুধাল—'টম্যাটোর চাষ কদ্দিন করছেন, মিয়াভাই?'

দোস্ত মহম্মদ মৃদু হাসল—'কি যে বলেন! আমাদের টেম্যাটো চাষ তো নানার আমল থেকে চইলে আসছেন। ত্যাখন ইস্টিশান কি আর এ্যামন ছেল, নাকি টেম্যাটো নিয়ে এখেনে কেউ আইসতো!'

লক্ষ্মীছেলের মতো বিশপবাবু চুপ করে তার কথা শুনছে দেখে উৎসাহিত হয়ে দোস্ত মহম্মদ তাকে অনেক নতুন কথা শোনাতে লাগল—'এ্যাখন শান্তিপুর গাড়িতে এ্যাক দিনে য্যাতো লোক উইটছে, ত্যাখন একমাসেও এতো লোক হোত নি। ঐ যে জলের কল দুটো দ্যাকছেন—বিটিশ আমলে তৈরী, বুঝলেন কিনা! আর ঐ শিমূল গাছ, ঐ সেগুন গাছ, আর উই আমগাছ—শও বছর তো হবেনই। মাস্টার ত্যাখন খড়ের ঘরে থাইকতেন।

ইস্টিশান বইলতে তো ছোট্ট এ্যাকটা টিনের ঘর। এধার ওধারে সব জঙ্গল!'

দোস্ত মহম্মদের কথা থামতে চায় না। সে একরকম ভেবেই নিয়েছিল, বিশপবাবু শান্তিপুরে নবাগত। তার কাছে আরও খানিক এগিয়ে এসে অবাক করে দেওয়ার মতো সে এবার বলল—'জানলেন কিনা, ঐদিকটাতে রেইতের বেলায় বাগ ডাইকতো। মাইরি বলছি!'

বিশপবাবুর মুখ থেকে এবার শুধু একটি শব্দ বেরোল—'বটে!'

দোস্তমহম্মদ মুখে একটি বিস্ময়সূচক শব্দ করে বলল—'আলবৎ। কিন্তু বিশপবাবুর সাংঘাতিক রকমে বিস্মিত হবার লক্ষণ দেখা গেল না। দোস্ত মহম্মদ কিছু ক্ষুণ্ণ হল।

বিশপবাবু মনে মনে একটি কথা ভাবছিল—ট্রেন না এলে এতো টম্যাটোর কি গতি হবে? সহানুভূতির স্বরে সে বলল—ট্রেন তো খুবই লেট মালুম দিচ্ছে মিয়াভাই। ঘাবড়াবার কিছু নেই বলছেন?'

'কিসসু না, কিসসু না।' দোস্ত মহম্মদ নিশ্চিন্ত জবাব দিল—'কইলকাতার আগ্রাসী ক্ষিধে মশাই। ট্রেন য্যাখনই আসুক না কেন, ঝুড়িগুলো একবার তুলে দিলেই হল। পয়সা ঠিক ঘরে চইলে আসবেন। আঠারো বিঘে ভূঁইয়ে টেম্যাটো চাষ করি মশাই—কক্‌খনও লোস্কান খাই নি!'

সরল সোজা দেহাতী চাষীর আত্মবিশ্বাস দেখে বিশপবাবু মুগ্ধ না হয়ে পারল না। টম্যাটো ঝুড়ি গরুর গাড়িতে তুলে রাতের শেষে দোস্ত মহম্মদ কানে বিড়ি, কোচরে মুড়ি, গলায় গামছা বেঁধে বাগ-আঁচড়া থেকে রওনা হয়েছিল। স্টেশনে পৌছে গরু দুটোকে বিচুলি দিয়ে নিজেও চা-মুড়ি খেয়ে নিয়েছিল। চা, মুড়ি, আর তেলেভাজা। নটসূর্য অহীন চৌধুরি বাগ-আঁচড়ার লোক বলে দোস্তমহম্মদ ভারি গর্ববোধ করে। বিশপবাবু বলল—'আপনি তাঁকে চিনতেন?'

'তা আর চিনবো নি, কি যে বলেন!' বিস্ময়সূচক এক শব্দ

করে দোস্ত মহম্মদ বলল—' তিনি যে খাসা এ্যাক্টো করতেন। সেবার কি হল জানেন? মেঠো পথে গাড়ি তার বসে গেছেন। আমরা গিয়েই না ঠেইলেঠুইলে তুইলে দিয়েলাম। আজ্জা লোক মশাই।'

গাড়ি না আসার জন্য মাণিকের মার কিন্তু উদ্বেগের অন্ত ছিল না। তারও বাড়ি বাগ-আঁচড়ায়। কিন্তু রাজা-লোকের গল্প শুনলে তো আর পেট ভরে না। অন্য অনেকের মতো সেও এক ডি পি। শান্তিপুর শিয়ালদার মধ্যে যে কোন স্টেশনে নেমে তাকে শাক বেচতে হবে। বেতি শাক। নইলে পেট চলবে না। মাণিকের কথা উঠতেই তার মা বলল—সেয়ানা ছেলে গো, পনেরো পা-র হয়ে গিয়েছে। ঘোষেদের বাড়িতে কাজেও নেগেছে।'

'সেখানে টাকাকড়ি কিছু পাচ্ছে না?'

'পা-চ্ছে। দশ ট্যাকা মাসে। কিন্তুন, আমি হাত পাতি না। মাণিক ট্যাকাটা জমায়।'

'কিন্তু বলছিলে না, দিনে তোমার রোজগার মোটে দেড়-দুটাকা? তাতে কি আর মা-বেটির চাল-ডালের ব্যবস্থা হয়?'

'চাল কোথায় পাব? খাই তো ক্ষুদ। কালে-ভদ্রে আটা। আমরা বাজার করি, নাকি তোমাদের মতো রোজ চাল ডাল মাছ দুধ কিনি?'

সহানুভূতির সঙ্গেই বিশপবাবু বলল—'ছেলের টাকাটা নিলেই পারো, মাণিকের মা?'

সুদিনের আর যেন দেরি নেই তেমন কণ্ঠে মাণিকের মা জবাব দিল—'সোউত্তর ট্যাকা জমলেই একটা দামড়া কিনব। দুউশো ট্যাকা বিক্‌কিরি! কিন্তুন বেইচবো নি। নাঙ্গল হবেন। একটা দামড়া আছে কিনা!' রোজ দেড়টাকা আয়করা দুঃখী জননীর মুখে গরিবী হাসি ফুটল।

'কিন্তু নাঙ্গল-জমি হলে ছেলে যদি ভাত না দেয়?' কথাচ্ছলে বলে দারিদ্র্য লাঞ্ছিতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারকে বিশপবাবু দেখতে লাগল।

'তাহলে? তা হলে আগে মেয়েটিকে বে দেবো। আর আমার কথা? শাক বেইচে ক্ষুদ ফুটিয়ে একটা পেট চইলে যাবেই।' ভবিষ্যৎ যেন ছক-কাটাই ছিল। তাই এতো সহজে মাণিকের মা কথাটি বলতে পারল।

তখনও ট্রেনের দেখা নেই। কেউ কেউ ভাবছিল, আরও অপেক্ষা করবে, নাকি বাড়ি ফিরে যাবে ট্রেন না এলে অবশ্য চাকুরেদের মন খারাপ হয় না। তবে লেটে এলে অসুবিধা—যাওয়ার কথা ভাবতে হয়। গিরিজা গোঁসাই আজও কিন্তু লেট ছিল। ট্রেনের দেরি দেখে আফসোস করতে করতে সে বলল—'এমন দিন ছিল, বেলা চারটেতে গিয়েও হাজিরা দিয়েছি—হ্যাঁ, এই শান্তিপুর থেকে গিয়েও। দিন কাল পাল্টে গেছে বিশপবাবু। এখন দশ মিনিট লেট হয়েছ কি, কারণ দেখাও। যতো সব—'। গিরিজা আর অযথা বাক্যব্যয় না করে বাড়ির দিকে হাঁটা দিল।

অরুণও মনস্থির করতে পারছিল না বাড়ি ফিরে যাবে কি না। বিশপবাবু তাকে দেখে চমকে উঠল—'আরেঃ, অরুণ!' অরুণের সঙ্গে বিশপবাবুর কালে ভদ্রে এক কামরায় দেখা হয়। কামরার পর কামরা চাখলে এমনটি না হয়ে যায়?

'তা হলে সেই কাজই তো করছ অরুণ?' বিশপবাবু সুধালো। সেই কাজ বলতে কলকাতায় পোর্টকমিশনে গঙ্গার ঘাটে ঝাঁট দেওয়ার কাজ। বি-এ ফেল করেই অরুণ কাজের সন্ধান করছিল। 'ছোট-কাজ' হলেও এটি সে নিয়েছিল সায়েবদের আশ্বাস পেয়ে—ভাল কাজ সে পাবে। কিন্তু পায় নি। তাই আজও সে গঙ্গার ঘাটে ঝাঁট দিচ্ছে। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছে। অরুণের সঙ্গে বিশপবাবুর প্রথম আলাপও হয়েছিল গঙ্গার ধারে। আউটরাম ঘাটে। একবছর আগে। বিশপ তখন স্বেচ্ছা-ভবঘুরে।

'বে থা করেছ অরুণ?' বিশপবাবু প্রথম আলাপের দিনই শুধিয়েছিল।

অরুণ অবাক হয়ে জবাব দিয়েছিল—'না, না! নারী সঙ্গ

জীবনে নয়। বরং মা-বোন মাসি-পিসি ডাকব, সম্মান করব—ককখনো কাছে ঘেষবো না।

বিশপবাবু আবার বলেছিল—'কেন মেয়ের প্রেমে পড়েছিলে বুঝি ?'

গম্ভীর মুখে অরুণ জবাব দিয়েছিল—'আমি ওপথে নেই।'

এই সেই অরুণ। আরও গম্ভীর। তার উপর মুখে স্পষ্ট একটি উদ্বেগের ছায়া আছে। তার বাবার জন্য। কারণ বেচারা সাদাসিধে লোক। গাঁয়ের রমণী চাটুজ্জে তাকে কষ্ট দেয়, উকিলে ঠকায়, দুবিঘে ভুঁইয়ে ধান করলেও বি-ডি-ও লেভি নেয়।

অরুণের বাবা খগেন দাসও ভেবে পায় না, কি করে চাটুজ্জেকে দমন করবে। একদিন রমণী চাটুজ্জে তো তাকে মেরেই বসল। এখন আবার সে হাফ-নেতা। জাঁক করে দুর্গাপূজা করে। পনেরোই আগস্ট বাড়িতে পতাকা তোলে। গরিবদের মিষ্টি খাওয়ায়, কাপড় দেয়। লোকে অবাক হয়ে ভাবে, রমণী ঠাকুর পয়সা কোথায় পায়। সম্প্রতি খগেন দাসকে সে আবার শাসিয়ে গেছে। অরুণের উদ্বেগটি এইখানে।

ভোর চারটের আগে উঠে অরুণের মা ভাত রাঁধতে যায়। বেচারার ভয় করে। বোলো হরি, হরিবোল শুনলে প্রাণটা কাঁপে। তবু ছেলেদের জাগায় না। সারাদিনে কাজ কি কিছু কম ? ছেলেরা কাজে বেরিয়ে গেলে সে ধান সেদ্ধ করে, কলে নিয়ে গিয়ে স্বামী সে-ধান ভাঙায়। চাল বেচে। তবু অকুলান সংসার। একবেলা ভাত, একবেলা রুটি হয়। সংসারে খাওয়ার লোক কি আর কম ? ভাইবোন মিলে অরুণরাই তো আটজন। খগেন দাসের ধারণা ছিল, আটটি যদি শুধু-ছেলে জন্মে, প্রতি ছেলে যদি মাসে পঞ্চাশটি টাকাও হাতে দেয়, তা হলে মাসে চারশ' টাকা তো হচ্ছেই—সংসার দিব্যি চলে যাবে।

অরুণকেও বাড়ির দিকে রওনা হতে দেখে বিশপবাবু ঢুকল এসে স্টেশন মাস্টারের কামরায়, ঢুকেই শুনতে পেল—'শক্তিবাবু

নাকি? হ্যালো, শুনুন—গাড়ি এখনও আসে নি। কেশনগর? আপনি তা হলে শান্তিপুরে আসছেন না? হ্যালো—'

স্টেশন মাস্টার ফোন করছিলেন। কামরা চারদিকে বন্ধ করা। ওদিকের জানালা খুললে পায়খানার গন্ধ, এদিকের দরজা খুললে বিড়িপোড়া গন্ধের সঙ্গে পচা টম্যাটো, বস্তা-ঠাসা বাঁধা কপির ভ্যাপসা গন্ধ এসে একাকার হয়। ভেতরে লোক গিজ গিজ করছে—যতো সব উদ্বিগ্ন যাত্রী। অনেকে এসেছে তামাসা দেখতে। কিন্তু স্টেশন মাস্টারের ফোনালাপ থেকে কেউই বুঝতে পারল না, কে শক্তিবাবু কেনই বা তিনি শান্তিপুরে আসছেন না। গত রাত থেকে এ পর্যন্ত একশ তেরো নম্বর ইন করে নি। একঘর লোকের মধ্যে একজন ডি পি চেঁচিয়ে উঠল—'রানাঘাট ধরুন না মশাই, রানাঘাট কি বলছে শুনুন।'

মাস্টার মশাই বললেন—'কি আর ধরব বলুন? পাওয়ার ব্লক ছিল। শিয়ালদা থেকে এখন শুধু বানপুর ছেড়েছে।'

একটি টিপ্পনী-কাটা কণ্ঠ শোনা গেল—'পাওয়ার ব্লক কথাটা এখন আবার কোত্থেকে এলো মশাই?'

উত্তর দিল আরেক যাত্রী, রেডি-মেড উত্তর—'আরে থাম, একটা কিছু বলতে হবে তো!'

কালো কোটের বোতামে সস্নেহে হাত বুলিয়ে মাস্টার মশাই বললেন—'জিজ্ঞেস করলে তাই তো বলছে, বিস্তৃত কিছু ভাঙছে না।'

জনতা না-বুঝ। ক্রমেই তারা তেতে উঠছে দেখে স্টেশন মাস্টার সংশোধিত ভাষ্যের মতো করে বললেন—'আসল কথা কি জানেন? শিয়ালদা আমাকে কিছু বলে নি। কনট্রোল রুমে ওরা বলাবলি করছিল। আমার কানে এসে গেল—পাওয়ার ব্লক। গুজব শুনলাম আর কি!'

জনতার মধ্য থেকে দোস্ত মহম্মদ চেঁচিয়ে উঠল—'গুজবে কান দেবেন না!'

বিড়ির ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন কামরা খল খল করে হেসে উঠল।

নয়

গিরিজা গোঁসাই যেদিন কলকাতার আরপুলি লেনের বাসা ছেড়ে চিরদিনের মতো শান্তিপুরে চলে এলো, সহকর্মীদের সেদিন আর বিস্ময়ের সীমা রইল না। লোকটার বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ পেয়েছে নাকি? টাটকা মাছ, তাজা তরকারি, শাকপাতা? ভরতবাবু মনের কথা স্পষ্ট করেই বললেন—'বলি হিঞ্চে শাক, পটল পাতা, কলার মোচা—কলকাতায় কিছুরই তো অভাব নেই। ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে জীবনটি মাটি করতে চললেন গোঁসাই—একদিন পস্তাবেন।'

তা হোক। শাক-তরকারির দুর্বলতা নিয়ে কেউ খোটা দিলে গিরিজা গোঁসাই লজ্জাবোধ করে না। শান্তিপুরের গোঁসাই বাড়িতে সুক্তো, ঘণ্ট, ছেঁচকি হবে না তো হবেটা কোথায়? গিরিজা গোঁসাই কথাগুলো নিজের মনেই আওড়ায়, জোরে উচ্চারণ করে। প্রয়োজন বোধে। তাছাড়া যুক্তির জোরের জন্য চালু গল্প তো গোঁসাইকুলে আছেই।

শান্তিপুরে নিমাই এসেছেন। অদ্বৈতাচার্যের পত্নী সীতা দেবী রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত। শচীমাতার কিন্তু বড় সাধ, নিমাই যা যা ভালবাসে, নিজ হাতে তা রেঁধে খাওয়ান। নেহাত শাকপাতা বৈ তো নয়—কিন্তু পরের বাড়ির হেঁসেলে ঢুকে তো আর ইচ্ছামতো রান্না করা যায় না। অদ্বৈত গৃহিণী শচীদেবীর মনের কথা বুঝতে পেরে সব ব্যবস্থাই করে দিলেন। শান্তিপুরের গোঁসাই বাড়িতে জন্মের পর এমন সব গল্প ঘন ঘন শুনলে শাক-সজ্জী কি আর ভাল না লেগে পারে? বিশেষ করে শান্তিপুর-মাটির শাক তরকারির যা আস্বাদ!

কিন্তু গিরিজা গোঁসাইর পক্ষে কলকাতা ছেড়ে চলে আসা এমন

কি সাংঘাতিক কথা? হারাণ বঙ্গ, হরিপ্রসাদ সিড়ি, বৃন্দাবন দে—বিয়ের পর কলকাতায় কে বাসা না নিয়েছিল, কেইবা তা তুলে দিয়ে ফিরে না গিয়েছিল আপন ডেরায়, শান্তিপুরে? আর শুধুই কি শান্তিপুরের লোক? মার্টিনবাবু তা করে নি, কল্যাণীর দাদু করে নি? গিরিজা শঙ্কর গোস্বামী আপন মনে তর্ক করে হামেশা নিজের পক্ষে রায় দিত। রায় দিতে তার ভাল লাগত। কিন্তু এ সব অনেক কাল আগের কথা। শান্তিপুর থেকে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে করতে গিরিজা গোঁসাই এখন জীবনের মধ্য ভাগে পা দিয়েছে। লেট হোক, যাহোক চাকুরিটি সে বজায় রেখেছে।

গিরিজাশঙ্কররা অন্যদিনের মতো আজও উঠেছিল দুনম্বর বগীতে, লেডিজের সামনের কামরায়। ভিড় শান্তিপুর থেকেই আজ কিছু বেশি হয়ে পড়েছে। লেডিজে-উঠি-কি-এখানে ভাবতে ভাবতে মনস্থির করতে না পেরে জন কয়েক মহিলা যাত্রী শেষপর্যন্ত এখানেই উঠে পড়েছিলেন। ফলে, নারীসঙ্গ ছাড়া ট্রেন-যাত্রা যাদের বিস্বাদ বোধ হয়, সেই সব সৌখিন পুরুষের ভিড়ও কিছু বেড়েছিল বৈ কি! তবে কেউই তারা ডি-পি নয়।

অনেক জায়গার অনেক লোকই তো এই থ্রি হাণ্ড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুর লোক্যালে ওঠে, আপিস করে, কারখানায় যায়। কিন্তু এর লেডিজের আগে-পিছে দুটি কামরার মতো আর কোনটি এমন আপিসীয় ছাপে মহিমান্বিত নয়, কোন লোক্যাল গাড়িও বোধহয় থ্রি হাণ্ড্রেড থারটি-ফোরের মতো মর্যাদাকর নয় লোক্যাল গাড়িই কি আর কিছু কম আছে? রাণাঘাট লোক্যাল, কল্যাণী লোক্যাল, নৈহাটি লোক্যাল ইত্যাদির অন্ত নেই। অথচ কোনটিই যেন লোকালিক পূর্ণতায় স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়—যতো সব অর্ধপথের গাড়ি। হাওড়ার দিকে একবার চোখ ফেরান—লোক্যালগুলোর সেখানে যেন মান সম্মান নেই, হেলাঠেলা করে যাত্রীরা বলে নোকেল গাড়ি!

বিশপবাবু অনেকদিন এ-কামরা সে-কামরা করেছে, একই গাড়িতে দু তিনবার কামরা পাল্টেছে—ভেণ্ডার-কামরা, আপিস-কামরা,

শেষ-কামরা ইত্যাদি কিছুই বাদ দেয় নি। এখন সে কিন্তু জোর দিয়ে বলে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে চাও তো এক-কামরায় রোজ ওঠো—বিশেষ করে থ্রি থারটিফোর ডাউন শান্তিপুরে—এ যেন বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়ে অন্য একটি বাসা নেওয়া! নিজের বাসা। কিন্তু মজার ব্যাপার এই, এখনও বিশপবাবুর এক-কামরা বলে কিছু নেই। যেথায় যখন মন চায় উঠে বসে।

দুঃখের বিষয়, আজকের কামরাটি তেমন জুতসই নয়—পুরানো তো বটেই, বহুব্যবহারে মলিন। জানলাগুলো কাঠের। খড়খড়ি সব ভাঙা, দরজা বলতেও কিছু নেই। এখানে ফাঁক আর ওখানে ফোকর নিয়ে গোটা ছাদের অবস্থা বড়ই করুণ, ফোকলা দাঁতের মুখের মতো। তার উপর চালপাচারীদের তৎপরতার অন্ত নেই। বাচ্চা ছেলের কোলবালিশ সাইজের চালের পুঁটলি এই ফাঁকফোকরেই তারা লুকিয়ে রাখে।

গোটা কামরায় পাখা যে শুধু নেই-ই তাই নয়, সমূলে উৎপাটনের সময় অসতর্ক তস্কররা শ্রীছাদ ভেঙে ভেঙে বিশ্রী রকমের ভাঙ-চোর সৃষ্টি করেছে। কামরা অস্বাভাবিক নোংরাও বটে—ম্যাচের কাঠি, কমলার চোকলা, ছেঁড়া কাগজ, বাদামের খোসা এবং কফ-কাশ ছাই-ভস্ম ন্যাতা-ফিতার অন্ত নেই! সর্বত্র দেওয়াল-লিখনেরও শেষ নেই। অনেক লিখনের মধ্যে সব চাইতে চিত্তাকর্ষক বোধহয় একটি লেখা —'সীমা, আমি তোমায় ভালবাসি। কিন্তু তুমি আজ কত দূরে—সঞ্জয়।' এর উল্টোদিকে আবার সখ করে কে যেন বড় হরফে লিখে রেখেছে আপন নাম—রাম নারায়ণ রাম। সীমা কে, কোথায় কোন্ সুদূরে তার বাস, দুই নম্বর বগীও ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা তা জানে কি না বলা শক্ত। তবু সঞ্জয় নামে ব্যর্থ প্রেমিক শান্তিপুর লোক্যালে তার বিরহের গুরুভার যে এমনি করে নামিয়ে দিয়েছে তাতে আর সন্দেহ কি?

বাঁয়ের জানালার উপর-দেয়ালে উৎকলিত ছিল স্বয়ং মাউ-সে-তুঙের বাণী—'ওনলি এ লোন মঙ্ক ওয়াকিং দি ওয়ার্লড্ উইথ

এ লিকি আমব্রেলা'—একলা ফকির আমি, ছেঁড়া-ছাতা সম্বল করে বিশ্বের পথে ঘুরে ফিরছি। কে এই গোপনচারী মাউ-ভক্ত, চলন্ত ট্রেনে, এই বাণী-সঙ্কলনের কি তার মতলব, কে জানে। কিন্তু সীমা-প্রেমের অন্তিম পর্বে বেচারা সঞ্জয়ের অবস্থা যে বিশ্ব-পরিক্রমারত একলা-ফকিরের চেয়ে বিশেষ ভাল নয়, তা বুঝতে খুব অসুবিধা নেই। তবু কিন্তু আরেকটি ভাববার কথা আছে—প্রেমিকার বিরহে সকাতর সঞ্জয়দের জন্য তো এই মাউ-বাণী নয়, এ বাণী চিরন্তনী; চিরকেলে একলা পথিকের জন্য!

আজকের কামরাটি শুধু যে নোংরা এবং দেওয়াল লিখনে কলঙ্কিত তাই নয়, আসনগুলিও বিপর্যস্ত এবং বিশৃঙ্খলিত। পেরেকের বালাই না থাকায় ইচ্ছামতো উঠিয়ে নিলেই হল। অবিলম্বে ঘটলও তাই—শেষ সার থেকে একটি আলগা চেয়ার এক ভদ্রলোক এমন করে তুলে নিলেন, যেন এটি তার নিত্য অভ্যেস। কিন্তু তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ করে এক যুবক বলল—'চেয়ারটি উঠিয়া আনলেন যে বড়?'

হঠাৎ-খবরদারি ভদ্রলোকের সহ্য হল না! শ্লেষের সুরে তিনি বললেন—'কেন, তাতে কি হয়েছে?' শুধু কি হয়েছে বলার কায়দায়ই নয়, তার চেহারাতেও যেন কি একটা বিসদৃশ ভাব ছিল। সাদা ধুতি সাদা কোর্তার সঙ্গে ম্যাচ-করা নিকেলের চশমা পরলে কি হবে, তার গায়ের বিকট কালো রঙে, কালো মাথার কেশ-কুঞ্চনে, পান-খাওয়া-লাল মোটা ঠোঁটে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা, ঔদ্ধত্য, ক্রুরতা ছিল।

সরিয়ে আনা চেয়ারের উপর দার্শনিক কায়দায় ভদ্রলোককে বসতে দেখে কৈফিয়ৎ তলবের সুরে প্রাগুক্ত যুবক বলল—'চেয়ারটি উঠিয়ে আনা আপনার কি ঠিক হয়েছে?'

উৎপাটিত আসনের দখলদার পরিহাসের কণ্ঠে বললেন—'কোন্ আইনে বেঠিক হয়েছে জানি নে তো!'

'আইন যখন জানেনই না, চেয়ারটি তবে তুললেন কেন?' যুবকের কণ্ঠ এবার গম্ভীর এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক, তবে স্থির এবং প্রত্যয়-তীক্ষ্ণ।

অপর পক্ষের উত্তর এলো ঝড়ের বেগে—'বেশ করেছি।'

মুখে কিছু না বলে তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে যুবক জামার আস্তিন গুটাতে লাগল। বেশ-করা ভদ্রলোক ভাবলেন, যুদ্ধের সরাসরি আহ্বান ছাড়া এ আর কিছুই নয়। ক্রোধে আত্মহারা হয়ে তিনি বললেন—'কি হে, মারতে চাও নাকি? ভেবেছ, সব ডেইলি প্যাসেঞ্জার যখন এক কামরায়—'

আর বলতে হল না। মৌচাকে ঢিল পড়ে গেছে। এতো বড় বুকের পাটা দুনিয়ায় কার আছে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারের কামরায় উঠে তাদের উপেক্ষা করে, অমান্য করে, ঠেস দিয়ে কথা বলে? তারা রেলের মালিক, কামরার কর্তা, অপর যাত্রীর ভাগ্যনিয়ন্তা—অন্তত উটকো লোকে তাই ভাবে এবং বুদ্ধিমানরা তাদের এড়িয়ে চলে।

সমস্ত ডেইলি প্যাসেঞ্জারকে তুলে ভদ্রলোক কথা বলতেই হারুদা হৈ হৈ করে উঠলেন, মুখিয়ে উঠে বললেন—'আপনাকে সেই থেকে লক্ষ্য করে আসছি, কিন্তু কিছু বলি নি। এবার বলুন, চেয়ার যেখানে ছিল সেখানে রেখে আসবেন, নাকি আমাদের জোর প্রয়োগ করতে হবে?'

সঙ্গীসাথী ডি-পিরা যে হারুদাকে সমর্থন করবে সে তো জানা কথাই। কিন্তু অপরপক্ষের অশোভন ব্যবহারে আগেই সবাই বিরক্ত ছিল। ডি-পি অ-ডিপি নির্বিশেষে। সামান্যতম সমর্থনের আশা না দেখে ভদ্রলোক দুঃখের সঙ্গে চেয়ারটি যথাস্থানে রেখে এলেন।

মার্টিনবাবুর হঠাৎ যেন মনে হল, এতো সব ঝকমারির মধ্যে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে চাকুরি করাটা খুব সুখের নয়। বিশপবাবুকে সম্বোধন করে সে বলল—'জানলেন, এখনও আঠারো বছর আট মাস আঠাশ দিন আমার চাকুরি আছে। সরকার—'

বাধা দিয়ে বিশপবাবু প্রশ্ন করল—'শেষ আঠাশটি দিন ফেব্রুয়ারী মাসের?

আসলে মার্টিনবাবু যেমন ধারা মাস-দিনের সূক্ষ্ম হিসাব দিয়েছে,

তাতে শেষ-আঠাশ দিন ফেব্রুয়ারী মাসের হলে তার আঠারো বছর ন'মাস বলাই সঙ্গত ছিল। ব্যবহারিক জীবনে মার্টিনবাবু সূক্ষ্ম হিসাবেই বিশ্বাসী। কিন্তু আঠাশদিনের ফেব্রুয়ারী আদপে তার লক্ষিত নয়। অন্য কোন মাস হলেই তার এখানে হিসেবী সূক্ষ্মতা বজায় থাকে। সুতরাং এবার বিশপবাবুর প্রশ্নে আর সবার মতো সে নিজেও হেসে উঠল, তারপর অসমাপ্ত কথার জের টেনে বলল—'সরকার একসঙ্গে আঠারো বছর আটমাস আঠাশ দিনের পুরো মাইনে দিয়ে দিলে আজই চাকুরি ছেড়ে চলে আসব।'

'হঠাৎ এতো বৈরাগ্য যে?' বিশপবাবু জানতে চাইল।

সঙ্গে সঙ্গে মার্টিনবাবু জবাব দিল—'পাপের দেশেই আর থাকব না—থাকলে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে হবে, ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করলে চাকুরি করতে হবে। বরঞ্চ কাশীবাসী হব।'

'সরকারের কাছে আগে আর্জি পেশ করুন'—বিশপবাবু এমন করে কথাটি বলল, যেন সে নিজে সংশ্লিষ্ট সরকারি ডিপার্টের লোক এবং মার্টিনবাবুর বাকি চাকুরির পুরো মাইনে অগ্রিম দিয়ে পদত্যাগ গ্রহণের কথা বিবেচনা করলেও করতে পারে।

মার্টিনবাবু বলল—'সরকার পর্যন্ত এখনও এগোই নি, তবে মাকালীর কাছে আমি কিন্তু একবার একটি আর্জি পেশ করেছিলাম।'

'কি রকম শুনি?' বিশপবাবু উৎসাহিত হল, আর সবাই উৎকর্ণ হল। যিশুর পূজারী মাকালীকেও যে জবাফুল দেয় তা সবাই জানে।

মার্টিনবাবু হেসে বলল—'সে এক মজার ব্যাপার। মন্দিরে গিয়ে বললাম,—মাকালী, লটারিতে দু'লাখ টাকা পাইয়ে দাও, একলাখ তোমাকে দেবো। মনে হল না মাকালী রাজী আছেন। তখন আবার কি বললাম জানেন? কি মাকালী, বিশ্বাস হল নি? ঠিক আছে, না হয় তোমার এক লাখ আগেই কেটে রাখো। এবার ছাড়ো দিকিনি বাকি এক লাখ টাকা!'

নেহাত বহুপ্রচলিত চাতুরির গল্প—মার্টিনবাবু সত্যি হয়তো মাকালীর সঙ্গে চালাকি করতে মন্দিরে যায় নি। কিন্তু সে ভাল

করেই জানে, কখন কি প্রার্থনা করতে হয়, কালী কিংবা যিশুর কাছে মাথা নোয়াতে হয়। অথচ মাকালীর কাছে তার প্রার্থনা করার কথা কিন্তু নয়।

ষাট বছর আগে মার্টিনবাবুর ঠাকুরদা জনার্দন পাটনী এনট্রান্স পাশ করলে গাঁয়ের পাটের আপিসের বড় সাহেব ডেকে তাকে কেরাণীর কাজ দিলেন। বরাত খারাপ—গাঁয়ের আর পাঁচজন ভদ্র সন্তান তার সঙ্গে একই আপিসে চেয়ারে বসে কাজ করতে নারাজ হলেন। জনার্দন বললেন—'বাবুরা চেয়ার নিন, আমি টুলে বসেই কাজ করব। ভদ্রমহোদয়গণ বেঁকে বসলেন—জনার্দন আপিসে বসে কাজ করলে আমরা পদত্যাগ করব।' নিজ গাঁয়ের লোক, নিজ গ্রামের পাটের আপিস। মনের দুঃখে জনার্দন চাকুরি ছাড়লেন। ধর্ম ছাড়লেন। দেশ-গাঁ ছাড়লেন। কলকাতায় এসে সগর্বে গ্রহণ করলেন খেরেস্তানী নাম, জন প্যাটন। তার অঢেল ধনবৃদ্ধি, মানবৃদ্ধি, গৌরববৃদ্ধি ঘটল—প্রসার প্রতিপত্তির সীমা রইল না। গ্রীষ্মের ছুটিতে দেশ-গাঁয়ের বাড়িতে গেলে প্রাগুক্ত ভদ্রমহোদয়গণ ডেকে ডেকে তাকে চেয়ার দিলেন।

জন প্যাটনের প্রতিপত্তিতে মার্টিনবাবুর বাবার চাকুরি হলেও মার্টিন গিলবার্ট প্যাটন কিন্তু চাকুরি পেয়েছিল নিজ ক্ষমতায়, এমন কি মাকালী কিংবা ভগবান যিশুর কাছে সকাতর প্রার্থনা না জানিয়েও। দেশ তখন স্বাধীন হয়েছে, জন প্যাটন বেঁচে নেই, ময়মনসিং-কিশোরগঞ্জের বাড়ির পাট চুকিয়ে তার বাবা গিলবার্ট প্যাটন ফুলিয়ায় এসেছেন। রেফুজি হয়ে।

ভগবান যিশু বলেছেন—'তোমার জীবনের ভাবনা ভাববে না—কি খাবে, কি পরবে তা নিয়ে দুশ্চিন্তা করবে না। মুর্গীগুলোর দিকে চেয়ে ছাখো—তারা শস্য বোনে না, কাটে না, গুদোমে সঞ্চয় করে রাখে না। তবু দয়াময় ভগবান তাদের আহার যোগান।'

ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে করতে মার্টিনবাবু কিন্তু জীবনের

বদলে মৃত্যুর কথা ভাবে। অপঘাত মৃত্যুর কথা। চাকুরির কল্যাণে খাওয়া পরার ব্যবস্থা তার আছে। তবু দুর্দিনে কি খাবে, কি পরবে না ভেবে সে পারে না। মুর্গীগুলোকে অনুসরণ না করে ফুলিয়াতে সে কয়েক বিঘা জমি চাষ করায়, শস্যাদিও সঞ্চয় করে রাখে—রেখে বুকে বেশ বল পায়। মার্টিনবাবু সত্যি বৈষয়িক লোক, হিসেবী লোক। কখনও কখনও হিসাব তার সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতার পর্যায়ে গিয়ে পড়ে। জিজ্ঞেস করুন—ক'টা বাজে? মার্টিনবাবু দিব্যি বলবে—দশটা দুই!

শিমুরালীর শর্মিলা রায় বলেছিল—'আপনি কি অসম্ভব ভাগ্যবান, ফুলিয়ায় আপনার নিজ-বাড়ি। কৃত্তিবাসের পুণ্য হাওয়া রোজ আপনার গায়ে লাগে।' মার্টিনবাবু জবাব না দিয়ে সবিনয়ে হেসেছিল—যেন এমন সত্যি কথা আর হয় না! সন্দেহ নেই, ফুলিয়ার কৃত্তিবাস, শান্তিপুরের অদ্বৈতাচার্য, নবদ্বীপের চৈতন্য মহাপ্রভু তার খৃস্টানী মন-চৈতন্যে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। যিশুর জন্মদিনে সে প্রার্থনা করে, আবার মাকালীকে পাঁঠা দিতে, মসজিদে সিন্নি চড়াতেও দ্বিধা করে না।

সার্বজনিক অনুরোধে মার্টিনবাবু আজ একটি গান গেয়ে শোনাল. নেহাত সিনেমা-চলতি গান, যা আজকাল অনেকেরই মুখে মুখে ফেরে—'হাতে গোলাপ দিতে গেলাম, নিলেনা—বললে, রাতের শেষে পাপড়ি ঝরে যায়। রুমাল দিতে গেলাম, বললে—রুমাল নিলে ছাড়াছাড়ি হয়।' গানের শেষে সবাই একবাক্যে স্বীকার করল, মনের মতো গানই বটে—সবার মনের কথা!

মার্টিনবাবু কিন্তু বিনয় প্রকাশ করে বলল—'জানেন তো হালিশহরের মিঠেকুমড়োর কথা? কলকাতার বাজারে তার কত নাম। অথচ হালিশহরে কিন্তু কুমড়ো-চাষ নেই। ওপারের তাবৎ মাঠ থেকে কুমড়ো এসে জমা হয় ডানলপ ব্রিজপাড়ায়—সেখান থেকে নদী পেরিয়ে হালিশহরে যায়, তারপর কলকাতায়। আমার অবস্থা তাই। গান শিখি না, সুর দিতে জানি না, গলা বেসুরো।

তবু গাই। সবাই খুশি হয়, হাত তালি দেয়—যত ভিড়ই থাক, আমার জায়গা সবাই ঠিক রাখে।’

‘জায়গা তো আজ পেয়েই গেছেন, এবার বাদাম ভাজা খান—হকারের কাছে বাদাম নিয়ে বিশপবাবু মার্টিন প্যাটনের হাতে গুঁজে দিল।

ডি-পিরা দলবলে নেহাত কম নয়। মোটা কাটতি আসন্ন দেখে ফিরিওয়ালা বলল—‘বাবু, টাটকা মাল—ঘিয়ে নয়, তেলে নয়, খাঁটি বালিতে ভাজা। যত খুশি খান। অসুখ করবে না।’

বালিতে ভাজা বাদাম-মুখে হকারের কণ্ঠ অনুকরণ করে বিশপবাবু বলল—‘তুমি না কালকেই বলেছিলে, বালিতে ভাজা নয়, তেলে ভাজা নয়, একেবারে ঘিয়ে ভাজা। যত খুশি খান, অসুখ করবে না!’

কিন্তু বাদামওয়ালা মুখ খোলার আগেই মোহন ময়রা ভিড় ঠেলে এগিয়ে এসে খুব কষে তাকে ধমক দিয়ে বলল—‘বলি আমাদের মাগ-ছেলেপেলে আছে, না কি? একাই তুই মাল বেচবি, আর আমরা সব হাত গুটিয়ে বসে থাকব?’ অবশ্য হাত গুটিয়ে বসে থাকতে তাকে হল না; বিশপবাবুর পয়সায় ডি-পিদের হাতে সে মিষ্টি তুলে দিল। শান্তিপুরের মিষ্টি; রসকদম্ব, রাজভোগ, পানতুয়া,—যা হরদম কলকাতায় চালান হচ্ছে বলে শান্তিপুরের লোকের ভাগ্যে মিলছে না। অন্তত অভিযোগ তো তোই। শান্তিপুরের মিষ্টি ছাড়া নাকি কলকাতার বিয়ে হয় না!

মাণিকের মাও রাজভোগ হাতে নিয়েছিল বটে, কিন্তু মুখে তোলে নি। বেচারার মনে পড়ে গিয়েছিল ছেলে আর মেয়েটার কথা। সেদিন কুয়াসা-ঢাকা শান্তিপুর স্টেশনে বিলম্বিত গাড়ির জন্য উদ্বিগ্না মাণিকের মার সঙ্গে বিশপবাবুর কথা হবার পর আজ এই দেখা। আজ আর বেতিশাক নয়, একঝুড়ি কমা-টম্যাটো এবং কিলো খানেক সজনে ফুল নিয়ে সে বসে আছে—বোধ হয় কাঁচড়াপাড়ায় নেমে বিক্রীর চেষ্টা করবে।

বিশপবাবু তাড়া দিল—‘কৈ গো মাণিকের মা, খাও।’ দূরমনস্ক

মাণিকের মা চমকে উঠল। আবার তখন বিশপবাবু বলল—'কিন্তু আজ যে তোমার ঝুড়িতে বেতিশাক দেখছি নি!'

মাণিকের মা একটু মৃদু হাসল। বিশপবাবুকে তাকিয়ে দেখে তার মনে হল, আর সব ভদ্দরনোকের সঙ্গে লোকটির যেন মিল কম; ডেকে ডেকে কথা কয়, সুখদুঃখের খবর নেয়।

সুখ আর কোথায়, যত সব দুঃখের খবর। দুঃখের কথা অনেক দিন মনে থাকে, সমব্যথীকে বলতে ভাল লাগে। ক্ষুদ-খাওয়া শাক-বেচা দুঃখিনী মাণিকের মা তার অকিঞ্চিৎকর পণ্যের খবর দিয়ে এবার বলল—'বেতিশাক যে ভূঁইয়ে ছেল নি বাবু!'

বিশপবাবু অবাক হল—'সে কি কথা!' তার রোজগারের সামান্য পথটি বন্ধ হয়ে যাবার আশঙ্কায় বিশপবাবু উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ল।

'হ্যাঁ গো বাবু', মাণিকের মা বলল—'আ-জাওয়া শাক কি না, গমের ভূঁইয়ে হয়। বুইনতে হয় না। গরিব-দুঃখী মানুষরা তুইলে নিয়ে বেইচে দেয়।'

'ভূঁইয়ের মালিক কিছু বলে না?' বিশপবাবু শুধাল।

মাণিকের মা ত্বরিতে জবাব দিল—'বইলবেটা কি, শুনি? খুশিই হয়। মুনিষ খরচা করে বেতিশাক তুলে তো আর তাকে ভূঁই সাফ হয় না।' বিনা মূলধনে দেড়-দুটাকা আয়ের এই তাদের মহৎ উৎস, এ [illegible]দের বহুভাগ্য।

মাণিকের মার চোখ দুটি আজ ফুলো ফুলো দেখাচ্ছে। মুখটিও ফুলে গেছে। সজনে ফুল কুড়িয়ে, কমা-টম্যাটো কিনে আগ-রাতেই সে ঝুড়ি সাজিয়ে রেখেছিল। গমের ভূঁইয়ে বেতিশাক নেই বলে তো আর বসে থাকা যায় না! কিন্তু ঘর এবং বাইরের আয়োজন সারতে সারতে কালকের রাত্ত একরকম না ঘুমিয়েই কেটে গেছে। দামড়াটার আবার অসুখ। তার সেবাযত্ন করে, মেয়ের জন্য দুটি ক্ষুদ ফুটিয়ে রেখে মাণিকের মা ঘর থেকে রওনা হয়েছিল। কে জানে তখন রাত্ত কটা। বাগ-আঁচড়া থেকে মেঠো পথে হেঁটে হাঁটতে সে যখন স্টেশনে পৌছাল, পূব দিকে তখন ফরসা হয়ে আসছে।

তার ফুলো ফুলো নির্ঘুম চোখ দেখে বিশপবাবু বলল—'সারারাত না ঘুমিয়ে কি করে এতো পথ হাঁটলে?'

মাণিকের মার মুখে একটু হাসি ফুটল, দুঃখের হাসি। হাসি মুখেই সে বলল—'অভ্যেস আছে, বাবু!'

এই অভ্যেসের অর্থটি যে কি মাণিকের মায়েদের মতো তা আর কে জানে? বিশপবাবুর মনে পড়ল ভিন-গাঁয়ে এক রাতের কথা। তারই ঘরে বিনা মশারীতে বাড়ির চাকরকে শুতে দেখে বিশপবাবু বলেছিল—'এতো মশার মধ্যে ঘুমুবে কি করে?'

উত্তর দিয়েছিলেন গৃহস্বামী—'আপনি কিচ্ছু ভাববেন না মশাই, ওদের অভ্যেস আছে!'

না ঘুমিয়ে না খেয়ে দেড়-দুটাকা রোজগারের জন্য ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করতে হয়, কুণ্ঠিতমুখে অপরাধীর মতো ট্রেনের কামরায় বসতে হয়—কারণ মাণিকের মায়েরা বিনা টিকিটের যাত্রী। খাওয়াই যাদের জোটে না, টিকেট কাটার পয়সা তারা কোথায় পাবে।

'কিন্তু টিকেট না কাটলে রেল-বাবুরা কিছু বলে না?' বিশপবাবু জানতে চাইল।

মাণিকের মা করুণ হাসি হেসে বলল—'কিছু কি আর না বলে? কিন্তু সে কথা শুনলে তো আর পেট চলে না। তবে হ্যাঁ, সে বাবুরা নোক ভাল। এক-আধটু মুখ-ঝামটা দেয়, ধমকায়, নেমে-যাও, বেরিয়ে যাও বলে। তারপর কি করে জানেন? অন্য যাত্রীর টিকেট দেখার ছুতোয় ইচ্ছা করে আমাদের এড়িয়ে যায়!'

গরিবকে দেখার লোক দুনিয়ায় কম নেই!

দশ

কল্যাণী স্টেশনে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের অনেকেই উঠে এসেছে। শিবাণী সেনও এসেছে। শিবাণী না এলে অনেকের মনে হয়, কল্যাণীতে কোন যাত্রী ওঠে নি, কোন মানুষ ওঠে নি। সবাই তাকে তাকিয়ে তাকিয়ে রোজ দেখে, আর অনেক কথা ভাবে। যার যা খুসি তাই। না ভেবে পারে না।

আর সবাই যখন আজ শিবাণীকে উৎসুক দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছিল, বিশপবাবুর মন আর চোখ ছিল তখন অন্য কোথাও। সে ভাবছিল, স্টেশনের নাম বিধান রাখলে কেমন হয়, শুধুই বিধান—চিত্তরঞ্জন, গ্লাডস্টোন, ওয়াশিংটনের মতো। তার এ-ভাবনার কোন সাক্ষী ছিল না।

থ্রি হানড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুরে শিবাণী সেন দীর্ঘদিন হরেক লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; সে তার নিজের গুণে নয়, নিজের রূপ এবং দৈহিক সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য। তার সাম্প্রতিক বিয়েটা সবার কাছে খুবই অসম্ভব ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে, কারণ বিয়ে করেছে সে বিনা নোটিশে, পূর্বাহ্ণে কাউকে আভাসমাত্র না দিয়ে। সাতদিন আগেও কুমারী শিবাণীকে যারা দেখেছে, তারা এখন ভাবছে, ব্যাপারটি শুধু আকস্মিক নয়, অস্বাভাবিক। বিগত এক সপ্তাহ যারা আপিস করে নি, শাঁখা-সিন্দুর পরা শিবাণীকে দেখে আপন চোখকে তারা বিশ্বাস করতে পারে নি—যেন সাতদিনের সময় বিয়ের পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং সদ্য বিয়ের পর তার আপিস করাটাও প্রত্যাশিত নয়। 'একি দেখছি' সবার এমনি একটি ভাব! কল্যাণীর বাঘা ঘুঘু ডেইলি প্যাসেঞ্জাররা কোন মহিলা ডি-পির বিয়ে নাকি এমন করে আগে কখনও ঘটতে দেখে নি।

শিবাণী সম্বন্ধে যাদের মনে একটু ইয়ে ছিল, অথচ একসঙ্গে

দীর্ঘদিন ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করেও না পেরেছে মুখ খুলতে, বা না দিতে পেরেছে কোন প্রস্তাব, তারা বেশ থ খেয়ে গিয়েছিল। শিবাণী যে এসব না বোঝে তা নয়, কিন্তু এখন কি আর বলার উপায় আছে— না, আমার বিয়েটা সত্যি নয়। বরং শিবাণী এখন সিঁথেয় খুব মোটা করে সিন্দুর দেয়, কপালে বেশ বড় করে ফোঁটা কাটে। সিন্দুরের ফোঁটা। আঠাশ বছর আইবুড়ো-থাকা মনের ঝাল যেন এমনি করেই মেটাতে হয়!

বিয়ের আগে শিবাণী এক কামরায় উঠে শুধু এক সঙ্গেই যেতো না, অন্য অনেক ডেইলি প্যাসেঞ্জারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকত, আলাপ-সালাপে সহযোগিতা করত, শর্মিলাদের মতো হাসিমস্করাতেও যোগ দিত। মার্টিনবাবু যখন প্রশ্ন তুলত পুরুষ কোন্ লিঙ্গ, এবং হরিপ্রসাদ সিঙ্ঘি যখন তার কৌতুককর জবাব দিত, শিবাণীরা তখন চাপা ঠোঁটে হাসত। কিন্তু বিয়ের পরই শিবাণীর পরিবর্তন এলো—সবার সঙ্গ, সব প্রসঙ্গ এড়িয়ে উঠল গিয়ে লেডিজে। সেখানে কুমারী ডি-পিদের প্রশ্নের শেষ নেই, কৌতূহলের অন্ত নেই দেখে শিবাণী তেমন কৌতুক-বোধ করল না—তাদের ত্যাগ করে উঠল গিয়ে ভেণ্ডার কামরায়। সকালের গাড়িতে রাতের স্বপ্ন দেখে এবং ফিরতি পথে ভ্রাম্যমান কীর্তন-সঙ্ঘের গান শুনে এ ক'দিনের ডেইলি প্যাসেঞ্জারি তার মন্দ লাগছিল না। কিন্তু আজ থ্রি হাণ্ড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুরের দুই নম্বর বগীতে শিবাণীকে উঠতে দেখে মার্টিনবাবুরা উৎফুল্ল তো হলই না, বরং দেখেও যেন দেখল না—কোন পাত্তাই দিল না। বিয়ে হয়ে গেছে তো ব্যস্—আর কেন!

আজ মার্টিনবাবুদের কামরায় দাদু উঠেছেন। ভদ্রলোক উকিল— ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করে কলকাতায় গিয়ে ওকালতি করেন! ছাব্বিশ বছর করছেন—শীতে, গ্রীষ্মে, বর্ষায়। বিরাম নেই। তাঁকে দেখে আজ বিশপবাবুই প্রথমে মুখ খুলল—'আসুন, আসুন দাদু।' দাদু একটু প্রসন্ন হাসি হাসলেন। চোখে-মুখে-গোঁফে সে-হাসি ত্বরিতে ছড়িয়ে পড়ল, এক ফোঁটা জলে অনেকটা ব্লটিং পেপার চুপসে যাবার মতো।

দাহুর বড় বড় চোখ, তীক্ষ্ণ বাঁক-নেওয়া জঙ্গুলে ভ্রু। মাথায় শুকর কেশের মতো মোটা চুল। তার উপর ৵ডিগলের মতো দাহু আবার খড়্গ-নাসা এবং নাকের নিচে একজোড়া আশুতোষী গোঁফও আছে। গোঁফের রঙ ধবধবে শাদাই বটে, শুধু উপর-ঠোঁটের ধার দিয়ে তামাক-পোড়া নিকোটিনে অল্প একটু কটা।

দাহুকে চোখে পড়তেই মার্টিনবাবু, হরিপ্রসাদ, অমিয় সান্যাল সমস্বরে বলল—'আসুন দাহু, আপনার জায়গা রেখেছি।' শিবাণী সেনের কিন্তু মনে হল, এই স্বাগতম আসলে তারই পাওনা—কারণ প্রাক-বিবাহ যুগে সে পেয়ে এসেছে। মনে হিংসা, মুখে গাম্ভীর্য নিয়ে সরে গিয়ে রড ধরে সে দাঁড়িয়ে পড়ল।

মুখে কিছু না বলে সবাইকে দাহু একটু তাকিয়ে দেখলেন। মনে হল, তার চোখদুটিই শুধু দেখছে না, নাক-মুখ-গোঁফও দেখবার কাজে নেমে পড়েছে, সবাইকে ঠিক ঠিক চিনে নিচ্ছে। সংরক্ষিত আসনের দিকে এবার তিনি এগিয়ে এলেন। আর তখন রতন খাসনবিস একেবারে যেন পৃথিবীর সমতলে দাঁড়িয়েই বলল—'আয়েন দাহু, আইজ আমার লগে বইয়া পড়েন।'

আদরের বাড়াবাড়ি অবশ্য কখনই দাহুর ভাল লাগে না। তিনি ট্রেনে-সঙ্গী ক্ষণেক-নাতি রতনকে প্রশ্রয়পুষ্ঠ ধমক দিয়ে বললেন—'চোপ, ফাজিল কোথাকার!' বড় বড় চোখে রতনকে তিনি দেখতে লাগলেন, যেন ফাজিল ছোঁড়াকে চোখে চোখে রাখার দরকার আছে। কিন্তু মুখে তাঁর কোনই বিরক্তি ছিল না।

হরিপ্রসাদের মুখ দেখেই দাহু ভাবলেন, আজ কপালে হয়তো কষ্ট আছে—তার বক বকানি শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা হবে। হরিপ্রসাদের পুরানো ঝুলির যা মাল! মুদ্রাস্ফীতি, কাঁচালঙ্কা, হরেকৃষ্ণ সঙ্ঘ কিছুই বাদ নেই!

শান্তিপুরের রাজপুত পাড়া থেকে সাইকেল চেপে এসে হরিপ্রসাদ রোজ গাড়ি ধরে। থ্রি থারটিফোর ডাউন শান্তিপুর লোক্যাল। একান্ত আপন লোকেরাই যেন সেই গাড়িতে বসে কলকাতায় যায়।

শান্তিপুরের লোক, হবিবপুরের লোক, রাণাঘাট-চাকদা-কল্যাণীর লোক—কত জায়গার লোক। তাদের সঙ্গে পাশাপাশি না বসে গেলে কি আর চলে? অথচ নিজের দেহের রক্তধারা যে বাঙালীর নয়, সে তা একরকম ভুলেই গেছে।

সোওয়া দুইশ বছর আগের কথা বটে তো। মগনীরাম যমুনাদাস সিং তখন মকসুদাবাদী নবাবের বেতনভুক সৈন্য। রাজপুত সৈন্য। অবসর গ্রহণ আসন্ন হলে নবাব সিরাজদ্দৌল্লা তাকে ঢাল-তরোয়াল এনাম দিলেন, আর দিলেন বিস্তর নিষ্কর জমি। শান্তিপুরে। মগনীরামের মতো অনেক রাজপুত সৈনিক শান্তিপুরের যে অঞ্চলে ঘর বেঁধেছিলেন আজ তাই রাজপুতপাড়া।

মগনীরাম যমুনাদাসের অধঃপুরুষরা কবে যে বাঙালী হয়ে গিয়েছিল, রাজপুত শোণিত চোলাই হতে হতে কবে যে দেহ থেকে উবে গিয়েছিল, তা তারা জানেই না। হরিপ্রসাদ সিংও না। সবচেয়ে বড় কথা, হরিপ্রসাদরা তা নিয়ে মাথা ঘামায় না—বরং দুর্গাপূজা করে, সজনে ফুলের চচ্চরি খায়, অদ্বৈত-চৈতন্য নামে রোমাঞ্চিত হয়। শারদীয় নবকল্লোল কেনে।

হরিপ্রসাদের মস্ত গুণ, গিরিজা গোঁসাইর মতো সে শেষ-খেয়ার যাত্রী নয়। তার চালচলনে তাড়াহুড়ো থাকে, উদ্বেগ থাকে। শেষ পর্যন্ত সময় যদি না পাওয়া যায়, অতএব সব কাজ এখনই সারা চাই। —এমন ধারা অস্বস্তি মন থেকে তার কখনই দূর হয় না। হরিপ্রসাদ ঘড়ির কাঁটায় ওঠে, চান করে, ভাত খায়—আমতলার স্ট্যাণ্ডে সাইকেল রেখে যখন স্টেশনে ঢোকে, গাড়ি ছাড়তে দুতিন মিনিটের বেশি তখন সময় থাকে না। কিন্তু গাড়িতে উঠে বসেছে কি, ব্যস্—বকবকানি তার শুরু হয়ে গেছে!

গতকালের ট্রেনে-কাটা-পড়া মেয়ের কথা আপন কামরায় বার কয়েক সে উল্লেখ করেছে বটে, কিন্তু বিস্তৃত বিবরণ দেয় নি—সুযোগও ঘটে নি। হরিপ্রসাদ হয়তো ভেবে থাকবে, কল্যাণীর পর শান্তিপুর লোক্যাল যখন ঘোড়ার কদমে এগিয়ে চলবে, গল্পটি জমবে ভাল।

হরিপ্রসাদের আপন চোখে দেখা মর্মান্তিক দৃশ্য—ট্রেনের তলায় মানুষ মরা। আজকের আর কেউ দেখে নি এবং শোচনীয়তা ধারণা করতে পারে নি ভেবে হরিপ্রসাদ বলল—'কি দৃশ্য মাইরি! মেয়েটা জমির আল ধরে আসছিল! কেশনগর তখন নৈহাটি ছেড়েছে। তার ভ্রুক্ষেপ নেই—চলছে তো সে চলছেই। শেষ পর্যন্ত পড়্ তো পড়্ কেষ্টনগরের চাকার তলে।'

বিশেষ উৎকণ্ঠার সঙ্গে বিশপবাবু বলল—'ড্রাইভার গাড়িটা থামিয়ে দিল না কেন?'

'মাথা খারাপ! নাম ভূমিকায় অভিনেতার মতো হরিপ্রসাদ বলল—'গাড়ি তখন থামানো যায়? তাছাড়া কেস্টনগর, সাক্ষাৎ যম!' অন্য শান্তিপুরীদের মতো হরিপ্রসাদও কৃষ্ণনগরকে কেশনগরই বলে, তবে গুরুত্ব বিশেষে তার মুখে কেশনগর শেষপর্যন্ত কেস্টনগরে রূপান্তরিত হয়। বিশেষ করে কেশনগর যে প্রাণঘাতী, সেই কথা বলবার সময়।

হরিপ্রসাদ আসলে কেশনগর, রাণাঘাট, কল্যাণী-লোক্যাল, অথবা লালগোলা এক্সপ্রেস—কোন গাড়িকেই ভাল চোখে দেখে না। তার মতে গাড়ি বলতে শান্তিপুর। শান্তিপুর ল্যোকাল। গাড়ির রাজা—যাত্রী নেয়, মাল টানে, এমনকি কেশনগরকে পথ দিতে পনেরো মিনিট দাঁড়িয়েও থাকে। অথচ লেট নেই। টাইম-টাইম চলে। গুণী মানুষের মতো তার হালচাল আর মর্যাদা জ্ঞান। বলাবাহুল্য, শান্তিপুরের সবাই এ বিষয়ে তার সঙ্গে সেন্ট পারসেন্ট একমত।

বিশপবাবু বলল—'কিন্তু গাড়ির যাত্রীরাও তো হাত নেড়ে চীৎকার করে মেয়েটাকে সাবধান করে দিতে পারত?'

হরিপ্রসাদ সিং একটু হাসল—যেন বিশপবাবু নির্বোধের মতো যা তা বলছে। হাসিমুখে বিজ্ঞের মতো সে বলল—'সাধ্য কি মশাই, মেয়েটা সরে যায়? গাড়িই তো তাকে ডাকছিল, সাক্ষাৎ-যম কেস্টনগর ডেকে ডেকে বলছিল—'আ-য় আ-য় বেঁচে থেকে কি হবে? আয়,

এবার সব জ্বালা জুড়িয়ে নে।' হরিপ্রসাদ যেন যম-রূপী কেস্টনগরের ভূমিকায় অভিনয় করছিল, কালকের মৃত্যুপথযাত্রিণী হতভাগিনীকে আজও সে মঞ্চাভিনেতার মতো ডাকছিল—'আয়' আমার নিত্যশ্চল চক্রতলে পিষ্ট হয়ে মর্।'

'অ্যাম্বুলেন্স এসে মেয়েটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল বুঝি?'

'হাসপাতালে নেবে কি মশাই, দেহ কি আর তখন আস্ত আছে? চাকায় জড়িয়ে লেপ্টে চেপ্টে কিমা হয়ে গেছে। মটন কিমার মতো। কোথায় তখন হাড় মাস, কোথায় চোখকান—কোথায় যুবতীর বসন্ত বাহার?'

'আপনি যুবতীকে চিনতেন?' বিশপবাবু জানতে চাইল।

'অবাক করলেন! কোন্ যুবতীকে কবে আবার কে না চেনে?'

রতন খাসনবিস এবার মাথা উঠিয়ে বলল—'ঠিক কইচো হরিদা। এপাড়ায় হেপাড়ায় যুবতী মাইয়া আছে, আর তুমি তার খবর রাহো না, হাইল চাইলের নাড়ী টেপো না, তা অয় নাহি!'

অত্যন্ত শোকাবহ ঘটনার আলাপ আলোচনা সত্ত্বেও সবাই হেসে উঠল। শর্মিলা রায় নিঃশব্দে মাথা নত করল। বিনতা নন্দীর যেন কেমন একটি উদাস ভাব। যুবতী নারীর কথা উঠলে আজকাল কে-জানে-কেন সে ভাবে, সবাই তাকে ঠেস দিয়ে কথা বলে।

হরিপ্রসাদ মৃতা যুবতীকে চিনত বটে। মুখ-চেনাই বলা যায়। এবং একটি তার নেপথ্য সূত্রও আছে। কারণ নৈহাটি তার শ্বশুর বাড়ির দেশ। নৈহাটির অদূরে দেউলী গ্রামের হাজামজা এক খালধারে কয়েকঘর মাহিষ্য সম্প্রদায়ের লোক দীর্ঘকাল বসবাস করে আসছে। 'কেষ্টনগরে' পিষ্ট যুবতী তাদেরই যেন কার বাড়ির মেয়ে। —মাঠে মাঠে সে শাক তুলত, কাটা-ভুঁইয়ে ঝরা ধান কুড়িয়ে বেচে দিয়ে পয়সা করত। হরিপ্রসাদ এর বেশি কিছু জানত না, তবে মনে মনে কল্পনা করত অনেক কিছু—ধান কুড়িয়ে সে কোথায় বেচে, শাক তুলে বাড়িতে নিয়ে যায়, নাকি বিক্রী করে—কোথায় বেচতে যায়, কার সঙ্গে তখন কথা হয়, কি সব কথা ইত্যাদি।

রতন খাসনবিসের খোঁচায় হরিপ্রসাদ ভাবল, মৃতা যুবতীর সঙ্গে তার পরিচয় ছিল এমন কথা প্রকাশ করলে ডেইলি প্যাসেঞ্জারদের মধ্যে কি তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে। কিন্তু কি ভেবে শেষ পর্যন্ত সে আত্মসংবরণ করল। আসলে মুখ খুলতে আর তার সাহস হল না।

দাতুর কানে এতক্ষণ সব কথাই আসছিল, আবার হয়তো কিছুই আসে নি। হরিপ্রসাদের বকবকানি আসলে তাঁর ভাল লাগে না—এমন কি তাকে মুখ খুলতে দেখলেই দাতু সতর্ক হন, সভার মাঝে সভাপতির মতো অনেক সময় ইচ্ছা করে অন্যমনস্ক হয়ে যান, যাতে কোন কথাই শুনতে না হয়। বিরক্তির সঙ্গে কৌতুক মিশিয়ে সম্প্রতি হরিপ্রসাদকে তিনি একটি নামও দিয়েছেন—বকাউল্লা!

অনেকদিন ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করছেন দাতু। তিরিশ বছর পূর্ণ হতে কতই বা আর বাকি আছে। কিন্তু ট্রেন-যাত্রার দীর্ঘদিনে বিশেষ একটি কাজ করেছেন তিনি—তুচোখ ভরে বিশ্বপ্রকৃতিকে দেখে নিয়েছেন। আজও দেখছিলেন। কাঁকিনাড়া তখন ছেড়ে গিয়েছে। ডানদিকে কত বাড়িঘর দেখা যাচ্ছে। নারকেল গাছ, আমবন, বাঁধা কপি ভূঁইয়ের অন্ত নেই। তুদিকে কত পুকুর, কত জলা-ডোবা। দূর থেকে জলগুলো কি নীল-নীলই না দেখায়! বাঁয়ে দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ—ধানের ক্ষেত, গমের জমি, সর্ষে ভূঁই। বোড়ো ধান রুইবার জন্য জমি তৈরী হচ্ছে। শ্যালো থেকে মেশিন-টানা জল গলগল করে মোটা ধারায় পড়ছে—টুকরো টুকরো জমিগুলো ভেসে যাচ্ছে। দূর থেকে মনে হচ্ছে, যেন একেক টুকরো কাচ, সূর্যালোকে ঝলমল। কি সুন্দর, কি সুন্দর! জমিগুলো সব মধুময়, জল মধুময়, তরুলতাগুল্ম সব মধুময়। দাতুর কেবলই মনে হয়, যা দেখছি, তা কি স্বপ্ন, না সত্য—যেন বিশ্বাসই হতে চায় না। সত্যি আশ্চর্য দেশে আমরা জন্মেছি—স্বপ্নের দেশ, সত্যের দেশ!

আজ দাতুর মন কানায় কানায় ভরে উঠেছিল। আনন্দে। কৃতজ্ঞতায়। কিন্তু কার প্রতি কৃতজ্ঞতা? যারা পুকুর কেটেছে,

গাছ বুনেছে, হোগলার ঘর বা দালান তুলে বাস করছে তাদের প্রতি, নাকি এমন সুন্দর রৌদ্র-উদার দিনে আজ যিনি দৃশ্যে শোভায় কৃতজ্ঞতায় মনটিকে ভরিয়ে দিলেন, তার প্রতি? কে তিনি? আজ এমন অনেক প্রশ্নই দাত্থর মনে উঠেছিল।

হরিপ্রসাদ হঠাৎ বলল—'দাত্থ, একটা সিগারেট খাবেন?'

উত্তরের অপেক্ষা না করে হরিপ্রসাদ সিগারেট বের করল। দাত্থ একটু দোটানায় পড়লেন। নেওয়া উচিত, কিংবা উচিত নয়? প্রথমে ভাবলেন—থাক, নেবো না। ফাজিল ফক্করদের সঙ্গে সম্পর্ক কম রাখাই ভাল। কিন্তু দ্বিতীয় মনটি তখনই বলল—দূর, ওরা খাতির করে, ভালবাসে। সিট ছেড়ে বসতে দেয়। ওরা ভাল। ওদের সিগারেট ভাল। ভাল লোকের ভাল সিগারেট নিতে দোষ কোথায়? তাঁর দ্বিতীয় মন জয়ী হল। হাত বাড়িয়ে সিগারেট নিতেই দাত্থর মুখে একটি হাসি ফুটল—এমনকি তার চোখমুখগোঁফও যেন একসঙ্গে হেসে উঠল। তিনি বললেন—'সিগারেট শেষ পর্যন্ত খাইয়েই ছাড়লি দেখছি।'

সিগারেটে টান দিয়ে দাত্থ ধুঁয়ো ছাড়লেন, সদ্য স্টার্ট-নেওয়া স্টিম এঞ্জিনের মতো। বিশপবাবু কাশতে লাগল। সিগারেটের ধোঁয়া তার সয় না। মনে পড়ে তার ছেলেবেলার কথা। সিগারেট তখন কি-এক স্বপ্নরাজ্যের বস্তু—কি তার মোহ-মধুর গন্ধ। বাস্থ, পটল, টিপুদের সঙ্গে মিলেমিশে আমবনে লুকিয়ে সে সিগারেট টানতেও ছাড়ে নি। কিন্তু কোথায় সেই মধুগন্ধ? পটল বিজ্ঞের মতো বলেছে—নিজে খেলে কি আর গন্ধ টের পাওয়া যায়? সিগারেট-টানা লোকের পেছনে হেঁটে দেখিস—ভুসভুস করে নাকে গন্ধ আসবে! এসব কথা মনে এলে এখনও বিশপবাবুর হাসি পায়।

শুধু দাত্থ নয়, মার্টিনবাবুদের হাতেও সিগারেট দিয়ে শলাই জ্বেলে হরিপ্রসাদ ধরিয়ে দিল। মার্চেণ্ট আপিসে কাজ করে বটে তো—হরিপ্রসাদ আদব কায়দা ঠিক জানে!

অসীম অবাক হয়ে বলল—'তুমি সিগারেট ধরালে না?'

হরিপ্রসাদ উদাসীর মতো উত্তর দিল—'সিগারেট আর খাবই না ঠিক করেছি—শালা এদেশেই আর থাকব না।'

সে কি কথা রে? মুখ তুলে দাদু বললেন। হরিপ্রসাদের চল্লিশের-কাছে বয়স হলেও দাদু তার সঙ্গে তুই তুকারি করেই কথা বলেন; যেন ছোকরাগুলোর সঙ্গে তার তফাত নেই।

'কি আর বলব দাদু' হরিপ্রসাদ দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলল—'বাড়িতে রোজই চোর আসে, কিন্তু একদিনও ধরতে পারি না।'

মার্টিনবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলল—'নিশ্চয় তোর বৌ আর তুই রোজ প্রাণের আবেগে চোরকে ডেকে বলিস—আ-য়, আ-য়, আমার ধনদৌলত সব লুটে নিয়ে যা, কেড়ে নিয়ে যা; আমরা সব ভোগ করতে পারছি না।'

সবাই হেসে উঠল। শর্মিলা রায় আর বিনতা নন্দীর হাসি খুব সশব্দ নয়, তবে আধো-আধো গদ-গদ আ-য় আ-য় বলে চোর-ডাকার কল্পনাটি তাদের বড় ভাল লাগল। হরিপ্রসাদের কিন্তু অপ্রস্তুত হবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না।

হরিপ্রসাদ বলল—'কি তাজ্জব মাইরি, প্রেমানন্দ ঘোষের বাড়িতে চোর ঢুকে সেদিন সব ফাঁক করে দিয়ে গেল। প্রেমানন্দবাবু তখন স্বপ্ন দেখছেন, জানালার শিক ভেঙে চোর ঢুকছে। উঠতে যেন ভয় করল। স্বপ্নেই তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, নিশ্চয় চোর-ফোর কিছু নয়—জানালার শিকে যে শীতলা গাইটি বাঁধা ছিল, টানাটানি করে সে-ই শিক ভেঙেছে। কিন্তু ওকি! দরজাও যেন খোলা-খোলা লাগছে! শীতু কি তবে দরজা ঠেলে ঘরে ঢুকল নাকি? প্রেমানন্দ ঘোষ আধো-ঘুমে আধো-জাগরণে ভাবছিলেন। শেষ পর্যন্ত স্বামীস্ত্রী যখন উঠলেন, তখন সত্যই জানালার শিক নেই, দরজা হাঁ-করা, তোরঙ্গ খোলা—বাসনপত্র সব হাওয়া। আমার ঘরে চোর একদিন ঢুকতেই পারল না।'

কাউকে কোন মন্তব্য করতে শোনা গেল না। শুধু দাদু দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে মুখে একটি অস্পষ্ট শব্দ করলেন—হুম্‌ম্‌!

'আরেকটি সিগারেট খাবেন দাত্থ ?' সত্যিকারের ভালমানুষের মতোই হরিপ্রসাদ জানতে চাইল।

মুখে সকৃতজ্ঞ হাসি ফুটিয়ে দাত্থ বললেন—'নাহ্। জানিস তো, বেশি সিগারেট খাওয়া হ্বাল নয়।' দাত্থর কথাবার্তায় এখনও পূর্ববঙ্গীয় টান আছে। ভালকে তিনি হ্বাল বলেন অজ্ঞাতে, কিন্তু সিগারেটকে সিগরেট বলেন একরকম ইচ্ছা করেই।

সিগারেট নিতে আবার হরিপ্রসাদ অনুরোধ করলে দাত্থ একটি মন্তব্য করলেন—'তোরা বুদ্ধিমান বটে, যত সব কম দামের সিগরেট খাস। সিগরেট খাওয়া আর বিষ খাওয়া তো একই কতা। বিষই যদি খেতে হয়, তাহলে আর বেশি দাম দিয়ে কেন ?'

বৃদ্ধ উকিল যখন নরম স্বরে কথা বলেন, গম্ভীর মুখে উপদেশ দেন, তখন তাকে দেখতে লাগে যেন বাবার মতো। আবার যখন হাসতে হাসতে তিনি রসিকতা করেন, অন্যের দেওয়া সিগারেটে টান মেরে তুড়ি দিয়ে ছাই ঝাড়েন, তখন তাঁকে দাত্থ ছাড়া আর কোন ভুমিকাতেই যেন মানায় না। অবশ্য গাড়িতে তাঁর দাত্থ-ভাবটিই বেশি প্রকট। অথচ ভদ্রলোকের যে একটি নাম আছে, দামোদর পোদ্দার লিখে তার পাশে যে এককালে স্পষ্ট করে বি-এ, বি-এল জুড়ে জোরে উচ্চারণ করতেন, সে খবর আজ অনেকেই রাখে না।

রতন খাসনবিস এবার একটি প্রশ্নের মতো প্রশ্ন করল—'আপনাগো ছোটকালে কি কি সিগরেট খাইতেন দাত্থ ?'

দাত্থ হেসে বললেন—'সে কতা কি এখন বলা যায়, নাকি মনে আছে ? অনেক রকম সিগরেটের চল তখন ছিল। তার মধ্যে 'চিলি' সিগরেট ছিল সব চাইতে দামে শস্তা, এক পয়সায় এক প্যাকেট—দশ কাঠি।'

'আরে ডাকাইত!' রতন খাসনবিসের উচ্ছ্বাস শোনা গেল। যদিও ব্যাপারটি আসলে কোন ডাকাতি ঘটিত নয়, তার বিস্ময় প্রকাশের ঢাকাই কায়দা—বুড়িগঙ্গাপারের স্টাইল, দাত্থর ধলেশ্বরী-স্টাইলের তুলনায় অল্প তফাত।

এবার মার্টিনবাবু একটি শক্ত প্রশ্ন করল—'দাদু, আজকালকার সিগারেট লক্ষ্য করে দেখেছেন? কারখানাতেই কিন্তু সিগারেটের গায়ে লিখে দেয়, স্মোকিং সিগারেট ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ—সিগারেট খাওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। একি সত্যি খদ্দেরের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সিগারেট ব্যবসায়ীর উদ্বেগ?'

দাদু খুব সহজ একটি জবাব দিলেন—'যতো সব ঢং, আগে চিঠি লিখে খবর দিয়ে ডাকাতি করা আর কি!'

মন্তব্যটি মোটামুটি সবার পছন্দ হল। দাদুর ব্যক্তিগত কাহিনীতে বেশি উৎসুক বলেই কিনা কে জানে, রতন খাসনবিস একটি অদ্ভুত প্রশ্ন করল—'দাদু' আপনে ছোটকালে খুব টেটিয়া আছিলেন, তাই না?'

'কি রকম?' দাদু উল্টো প্রশ্ন রাখলেন।

'রহম বুঝলেন না?' রতন বলল—'আন্দামানে গ্যাচেন নি? হেইখানে সমুদ্রের ধারে ধারে খুব ভোমা ভোমা হাঙর থাকে—হ্যারায় কয়, বদমাস মাচ্ছি। জলে নামচেন তো ব্যস, কুটুস কইরা পাউ কাইট্যা লইবো, টিয়ারও পাইবেন না।'

না হাসলে নয় তেমন করে দাদু একটু হাসলেন। ফাজিল ছেলেদের কথা হেসে উড়িয়ে দেওয়া ছাড়া কি গতিই বা আছে?

টেটিয়া? না, তেমন স্বভাব দামোদর পোদ্দারের ছিল না। আর সময়ই বা কোথায় ছিল। একরকম সংগ্রামের মধ্য দিয়েই কি আর তার প্রথম জীবন কাটে নি? সত্যিকারের বৈষয়িক জীবন সুরু হল তাঁর কবে—নেহাত চাকুরি পাবার পর বৈ তো নয়? অথচ দামোদর পোদ্দার কিন্তু ভাবতেই পারতেন না, সত্যি একদিন তাঁর চাকুরি হবে। যাকে বলে ঘোর থিয়োরি-অব-রিলেটিভিটির যুগ তখন। যার ডাণ্ডব সাইজের মামা নেই, মেসো নেই, চাচা নেই, তার থিয়োরি ছিল শুধু একটি—আসলে প্রবলেম। সমস্যা। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দরখাস্ত করার পর পরই দামোদর পোদ্দারের পরীক্ষায় বসবার নির্দেশ এলো। চাকুরি পাবার আশা না করেও

তিনি পরীক্ষা দিলেন। তারপর মুখে 'ইয়োর্স-ফেইথফুল্লি' হাসি ফুটিয়ে ইণ্টারভিউ দিলেন। কি সব সোজা প্রশ্ন! সায়েব শুধালেন—তোমার বংশের কেউ সরকারি চাকুরি করেন? আজ্ঞে না স্যার। দেশ কোথায় ছিল? আজ্ঞে স্যার, টাঙ্গাইল স্যার। পশ্চিম বাংলায় বাড়িঘর কিছু আছে? না স্যার। সোজা প্রশ্নের সহজ উত্তর। কিন্তু তারপর সায়েব বললেন—তুমি তো দেখছি ফ্লোটিং ডাভ হে। উড়াল ঘুঘু! দামোদর পোদ্দার আপন মনে বললেন—খাইচেরে!

কিন্তু দামোদর পোদ্দার চাকুরি পেলেন—পুলিস আপিসে। স্বাধীনতার যুগ-পরিভাষায় তখন তিনি করণিক—রিসিট-ডেসপাচে বসে ভয়ে ভয়ে কাজ করেন, হেড অ্যাসিস্ট্যাণ্টকে গুড মর্নিং বলেন, তারপর দুদিন যেতেই টের পেয়ে যান, একমাত্র বড় সায়েব ছাড়া কাউকে স্যার বলার দরকারই নেই। সহকারি ডিম্যালো তখন ফাইল লেখে, সত্যবাবু টাইপ করে, কেষ্টবাবু পান খেয়ে গান গেয়ে সময় কাটায় এবং পদ্মার হে-পারে কত নারকোল গাছ আর পুকুর ছিল তার গল্প করে।

চাকুরি পেয়ে কিন্তু দামোদর পোদ্দারের বিস্ময়ের সীমা রইল না। বুক ফুলিয়ে তিনি বলতে লাগলেন—'কে বলে চাকুরিতে স্বজন-পোষণ ছাড়া কিছু নেই? খুঁটির জোর না থাকলেও যে চাকুরি হয়, এমনকি পুলিসে, তার বড় প্রমাণ আমি—নিঃসহায় নির্বান্ধব, নেই-মামা!'

পুলিস মেসে পোদ্দার মশাইর ভালই দিন কাটছিল। দেশের স্বাধীনতার বয়স তখন এক, দামোদরের বয়স তিনের পিঠে এক কলকাতায় রেফুজি গিজ গিজ করছে, চালের দাম বেড়ে মনপ্রতি উনিশ টাকায় উঠেছে। ওপার-পাকিস্তানে লোক তখন ষাট-টাকা-মন চাল কেনে আর বলে—পশ্চিম বাংলায় শায়েস্তা খাঁর আমল চলছে! এই শায়েস্তা খাঁর আমলেই দামোদর পোদ্দার চটপট একটি কাজ করলেন—মেস ছেড়ে বাসা নিয়ে বিয়ে করলেন। এর আসল কৃতিত্ব অবশ্য রত্না দেবীর। পাত্রী দেখার আসরে দামোদর এবং

সত্যবাবুদের সামনে ঘটি-হাতা ব্লাউজ পরে বসে তিনি গেয়েছিলেন—'তোমায় করি নমস্কার, ওগো কর্ণধার!' দামোদর পোদ্দার খেলাচ্ছলেই পাত্রী দেখতে গিয়েছিলেন, ফিরে এসেছিলেন একটি প্রতিজ্ঞা নিয়ে। রত্নাকে বিয়ে করার প্রতিজ্ঞা!

সহকর্মীদের মধ্যে সত্যবাবু লোকটি বড় বেশি-অনুসন্ধিৎসু—কার বাড়িতে তালের বড়া ভাল, কুড়ি টাকা পাউণ্ডের চা কে খায়, কার বৌ দেখতে ভাল, কিন্তু মন ভাল নয়, সে সব ইতিহাস তার নখদর্পণে। মাত্র পঁয়ত্রিশ বছর বয়সে ভদ্রলোকের চুলগুলো সব শাদা। মুখ বুড়িয়ে যাওয়া। চোখ কটালমণি, কালিপড়া কোটরাশ্রয়ী। দামোদর পোদ্দারের বাসায় এহেন সত্যবাবুর পদধূলি সপ্তাহে একাধিক বার পড়ছিল। তার মারফতেই বড়সাহেব গীত-শ্রী রত্নাদেবীর গুণগানের কথা জানতে পেরেছিলেন।

সত্যবাবুই কথাটা একদিন দামোদরকে বললেন—'আপনার তো সর্বনাশ হয়েই গিয়েছিল পোদ্দার, বাঁকুড়ায় বদলীর অর্ডার হয়েছিল। "দিস অর্ডার ইজ ইন দি ইণ্টারেস্ট অব পাবলিক সার্ভিস" পর্যন্ত তখন টাইপ হয়ে গিয়েছে। সায়েব জানতে পেরেই তো রদ করে দিলেন।'

'কিন্তু আমি তো তাকে বলি নি।' খুশি হওয়ার বদলে দামোদর পোদ্দার উল্টো প্রশ্ন করলেন।

সত্যবাবু রহস্যময় হাসি হেসে বললেন—'তার নিজেরও তো কিছু ইণ্টারেস্ট থাকতে পারে!'

'অর্থাৎ!' অবাক হয়ে দামোদর পোদ্দার জানতে চাইলেন।

সরল সোজা মানুষটির মতো সত্যবাবু বললেন—'কি বলব মশাই, আপনার মিসেসের গান শুনতে তার বড় সাধ। বলেন তো একদিন নেমন্তন্ন করে নিয়ে আসি।' ঝাড়া-নাক আবার ঝেড়ে ডবল-টিপ নস্যি নিয়ে সত্যবাবু চোখটিপে হাসলেন।

দামোদর পোদ্দার সেদিন থ খেয়ে গিয়েছিলেন। সত্যকিঙ্কর গাঙ্গুলীকে সেদিন তিনি নতুন করে আবিষ্কার করেছিলেন।

এবার গঙ্গায় অনেক জল গড়িয়ে গেল। দামোদর পোদ্দার

পুলিসের কাজ ছাড়লেন। শ্যামবাজারের বাসা ছাড়লেন। শুরু করলেন ওকালতি। তারপর কল্যাণীতে বাসা নিয়ে ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করলেন। কল্যাণী-টু-কলকাতা।

এসব কথা মনে এলে প্রবীণ দামোদর পোদ্দারের এখন হাসি পায়। একদিন সত্যবাবুকে তিনি তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু আজকালকার ছোকরাগুলোর রকমই আলাদা, যত সব যাকে বলে ত্যাঁদোর—কিন্তু মারাত্মক রকমের ভক্ত। অথচ হাসতে হাসতে তাকে কিনা হাঙরের সঙ্গে তুলনা করে! কেউ বলতে পারে, পোদ্দার মশাই কারও সঙ্গে কখনও লাগতে গেছেন?

তাঁর জবরদস্ত দিনে দামোদর উকিল টাকা করেছেন বটে। কিন্তু সে যেন টাকা-কামানো নয়, নেহাত ওকালতির স্টাইল—তাতে পশার জমে, পয়সা আসে, সুনাম বাড়ে। ইনকাম ট্যাক্সের এক শাঁসালো মক্কেলকে এই দামোদর পোদ্দারই বলেছিলেন—'কিচ্ছু ঘাবড়াবেন না মশাই। আপনাকে শুধু তিনটি কাজ করতে হবে, খাতাগুলি সব পুড়িয়ে দেবেন, গোটাকত মিথ্যা বলবেন, আর আমাকে হাজার দুই টাকা দেবেন। ব্যস। তারপর নাকে সরসের তেল দিয়ে ঘুমুলেও ক্ষতি নেই।'

কিন্তু কৈ, কেউই তো তখন অভিযোগ করে নি, বদনাম করে বলে নি, দামোদর উকিল টাকার জন্য হাঙরের মতো হাঁ করে থাকেন!

অসীম প্রামাণিক ফক্করি করার মতলব না এঁটে একটি সরল সোজা প্রশ্ন করল—'দিদিমাকে আপনি কি প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন?'

দামোদর পোদ্দার যে গানে মুগ্ধ হয়ে রত্নাদেবীকে বিয়ে করেছিলেন, ট্রেনের আলাপচারীতে সেই কথাটি হয়তো আগে কখনও তিনি প্রকাশ করেছিলেন। এবং সেই থেকে পল্লবিত হতে হতে কথাটি দাঁড়িয়েছিল, দাদু প্রেম-করে-বিয়ে-করা লোক, প্রেমিক লোক—যেন আজকের বুড়ো মানুষের পক্ষে কি অসম্ভব কথা!

দাদু মৃদু হেসে বললেন—'আমাদের কালে তোদের মতো প্রেমটেম

করা সোজা ছিল না। আমরা কেবলই হুবয় পেতাম—মেয়েরা যদি বলে দেয়! আজকাল তো শুনতে পাই তোরা প্রেম-না-কি-যেন করিস, আর মেয়েরাই নাকি মহোৎসাহে সুবিধা করে দেয়।' ভয় কথাটা দাতুর এখনও রপ্ত হয় নি বলে ওপারের টানে 'হুবয়' হয়ে যায়।

শর্মিলারাও দাতুর কথা শুনে সবার মতো হাসছিল। হাসতে হাসতেই বিনতা নন্দী আলতো করে একটি প্রশ্ন করল—'আজকালকার মেয়ে সম্বন্ধে এতো খবর আপনাকে কে দেয় বলুন দিকিনি।'

'বলুন দাতু' বলুন—সবাই জোর দাবী পেশ করল। আসলে এটি ডেইলি প্যাসেঞ্জার জনোচিত ঐক্যবোধ, সব শেয়ালের এক রাঁর মতো।

এরপর একটি ব্যাপার ঘটল—দাতুর হাঁটুর উপর চোখ পড়তেই শর্মিলা বিনতারা ফিক করে হেসে ফেলল। ব্যাপারটি বুঝতে পেরে মার্টিনবাবু বলল—'দাতু' আপনার পোস্ট আপিস বন্ধ করুন।'

বিপুল হাস্যরোল উঠল। বেচারা দামোদর পোদ্দার! প্যাণ্টের খোলা বোতাম তুটি লাগাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তিনি কুণ্ঠিত হাসি হাসলেন। বোতাম কোথায়? ধোপার পাটে সব ভেঙে গিয়েছে কিন্তু উপায় কি? কোথায় সূঁচ, কোথায় সূতো, কোথায় সময়? গিন্নী বোতাম লাগাবেন? বড় ব্যস্ত লোক। তার ছেলে আছে, বৌ আছে, নাতি নাতনী আছে। কাজ কি তার কিছু আর কম? গিন্নীর উপর মাঝে মাঝে দাতুর রাগ হয় বৈ কি? কিন্তু করার কিই বা আছে? বিয়ের পর প্রথম যখন ছেলে হল, গিন্নী বললেন —তোমার ছেলে। তারপর আরও তুই ছেলে, তুই মেয়ে হলেও একই কথা, ছেলে মানুষ করা এবং মেয়ে বিয়ে দেওয়া পর্যন্ত তার একই বোল—তোমার ছেলে, তোমার মেয়ে। তারপর একদিন ছেলে বড় হল, মেয়ের বয়স বাড়ল। তাদের চাকুরি হল, বিয়েও হল। দামোদর উকিলের ঘরে নাতি নাতনীর বন্যা এলো। সঙ্গে সঙ্গে রত্নাদেবীর রঙ বদল ঘটল, এবং সুরবদলও—এবার তিনি বলতে লাগলেন 'আমার ছেলে, আমার নাতি' ইত্যাদি। 'আমি শালা

দামোদর পোদ্দার শেষ পর্যন্ত বারুদাস'। গভীর আক্ষেপের সঙ্গে সেদিন মনে মনে তিনি বলতেন—'মরুক গে, আমি কারও তোয়াক্কা রাখি না। আমি দিব্যি খাবো দাবো, কোর্টকাচারি করব, ভি-পি ছোঁড়া-ছুঁড়ীদের সঙ্গে কথা বলব। বেশ সময় কেটে যাবে।' দাতুর ঠিকই কাটছিল, শুধু প্যান্টের বোতামগুলো আর লাগানো হচ্ছিল না।

'দিদিমাকে তালাক দিলেই তো পারেন দাতু। মার্টিনবাবু হালকাসুরে বলল—'আপনার সেবাযত্ন করে না, খোঁজ নেয় না। অমন বৌ কেউ রাখে ?'

'তালাক দিলে আরেকটি পাব কোথায় ?' দামোদর পোদ্দার এমন সহজে কথাটি বললেন, যেন এটি প্রশ্ন নয়, কিন্তু উত্তর দেবার দরকার আছে।

'আরেকটার এখন আর দরকার কি ?' নিজের জবাবের বক্র-চটুল চতুরতায় মার্টিনবাবু মুচকি মুচকি হাসতে লাগলেন।

'সে কথা কি এখন তোরা বুঝতে পারবি ? যখন ভেবে দেখি আমার বৌ আছে, তখন বুকে বড় বল পাই। আমার কি তখন হয় জানিস ? তুনিয়ায় আমি একা নই। সারা জীবনের যিনি সঙ্গিনী, বুড়ো হলেই কি তার টান কমে, নাকি প্রয়োজন ফুরায় !' অন্তরের কথাটি বলতে পেরে পত্নীসৌভাগ্য সচেতন দামোদর পোদ্দার মুখবিস্তার করে প্রসন্ন হাসি হাসলেন। সকল জীবনের পরিপূর্ণতার হাসি। সুপূর্ণ হাসি।

যেন শেষ প্রশ্নের শেষ উত্তর জেনে নেবার দরকার আছে তেমন করে বিশপবাবু শুধাল—'আজকালকার ছেলেগুলোকে আপনার ভাল লাগে, নাকি মেয়েগুলোকে ?'

শর্মিলা রায়, চন্দনা চক্রবর্তী, বিনতা নন্দী উৎকর্ণ হল। কিছুমাত্র না ভেবে, কাউকে লক্ষ্য না করে দাতু বললেন—'মেয়েগুলোকে।'

ছেলের দল এই জবাব প্রত্যাশা করেছিল কিনা বলা শক্ত, তবে মেয়েরা করে নি। কারও কোন মন্তব্য প্রকাশ পাবার আগেই হরিপ্রসাদ সিঙি উপহাসের সুরে বলল—'সে তো বটেই। লক্ষা

পাকে আর ঝাল হয়। আজকালকার মেয়ে তো আপনার পক্ষে সব জোয়ান।—ভাল না লেগে পারে? আরও বছর পাঁচেক যাক, আরও কম বয়সীদের আরও বেশি ভাল লাগবে।'

দাদু কটমট করে তাকালেন বটে, তবে গোঁফের তলে একটু যেন হাসি ছিল। ছেলে আর মেয়ের দল চুপচাপ বসে তখনও ভাবছিল, দাদু এবার না-জানি-কি জবাব দেন। কিন্তু হরিপ্রসাদই আবার মুখ খুলল—'আজকালকার মেয়েগুলোও বলিহারি যাই মাইরি, নির্বিষ সাপ খেলাতে ওস্তাদ।' বোধহয় আরও কিছু সে বলতে যাচ্ছিল, হঠাৎ শর্মিলাদের অস্তিত্বে সচেতন হয়ে গেল।

হরিপ্রসাদের ঠিক খোঁচার চোটে নয়, তার কথার নিছক নির্বিবেক অশুচিতায় দাদুর মনটি বিষিয়ে উঠল। এমন অবস্থায় আত্মসংবরণ করা কঠিন, তা যতই হোক সে নিত্যযাত্রার ট্রেন-কামরায় হাসিমস্করার মহফিল। অবশ্য কাদার উপর কাদা না ছুঁড়লে আপাতদৃষ্টিতে জিৎ হয় না বটে, তবে নিশ্চিন্ত একটি ব্যাপার ঘটে—যারা কাদা ছোঁড়ে, তারা ছোট হয়ে যায়—হেরে যায়। দামোদর পোদ্দারের তা অজানা নয়।

কথার পৃষ্ঠে কথা বলে হরিপ্রসাদকে দিব্যি আজ দাদু ঘায়েল করতে পারতেন। রোজ তার বাড়িতে চোর আসে, অথচ ধনদৌলত চুরি করা তার লক্ষ্য নয়—সে-চোর কোনদিন ধরাও পড়ে না। সে যে কেমন চোর, কি তার লক্ষ্য, কেন ধরা পড়ে না, লোক-চড়ানো বহুদর্শী উকিলবাবু তা ঠিকই বুঝেছিলেন, কামরার বাকি লোকও বুঝেছিল। তবু কিন্তু ফাজিল হরিপ্রসাদকে খোঁচাটি ফিরিয়ে না দিতেই হৃদয়বান দামোদর পোদ্দার মনস্থ করলেন।

শান্তিপুর লোক্যাল তখন রাজকীয় মেজাজে এগিয়ে চলছে, আর দুর্মর চক্রঘর্ষণে একটি কথা বারবার নতুন সুরে ঝঙ্কৃত হচ্ছে—দাদু ভাল করেছ, দাদু ভাল করেছ!

এগারো

বৌবাজার থেকে হেঁটে যাওয়াই সাব্যস্ত করল বিশপবাবু। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নেহাত কম সময় কাটে নি। সামান্য কটি ট্রামবাস ছিল বটে, কিন্তু তাতে ওঠবার উপায় ছিল না। অথচ শিয়ালদা থেকে হেঁটে যাওয়াও চাট্টিখানি কথা নয়—রাস্তায় যা গিজগিজে ভিড়।

শিয়ালদায় আপিস-গাড়ি থেকে যখন যাত্রী নামে, দেখে সবার অবাক লাগে—এত লোক এক-গাড়িতে ধরা কি সম্ভব! বৌবাজারের মোড়ে গাড়ি-নিষ্ক্রান্ত ঘন-ঘিঞ্জি যাত্রীর মতোই জনস্রোত বইছিল। কলকাতা সত্যি যেন কল্লোলিনী হয়েছে।

কিন্তু শুধু লোকের ভিড়ই নয়, হরেক রকম উৎপাতেরও অন্ত ছিল না। ফলের খোসা, ডাবের খোলা, লিচুর পাতার নরক পায়ে পায়ে ঠেলে বিশপবাবু হেঁটে গিয়ে যখন ধর্মতলার মোড়ে দাঁড়াল, তখন মধ্যদিন পার হয়ে গেছে।

আজ বিশপবাবু বিনতার সঙ্গে দেখা করবে। অবশ্য বিনতাই তাকে দেখা করতে বলেছে। বলতে গেলে বিশেষ অনুরোধই করেছে। কিন্তু আজকাল সে নিজেই কি আর এটি কামনা করে না, তার মন কি আর চায় না, দুজনায় নিভৃতে খানিক বসবে, আলাপ করবে—কথা বলবে, কথা শুনবে! কত কথা—অল্প থেকে অনেক কথা।

বৈশাম্পায়নকে ছেঁটে কেটে বিনতাই একদিন বিশপ করেছিল। সেদিন বৈশাম্পায়নের কিছু মনে হয়েছিল, শুধু নাম নয়, এ হচ্ছে গোপন মনের একটি গভীর স্পর্শ—থর থর থর প্রথম পরশ কুমারীর! কিন্তু আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে বিশপবাবু কি আর তাকে জিইয়ে রেখেছিল, নাকি প্রতিদিনের দুর্মর প্রত্যাশায় তাকে সঞ্জীবিত করেছিল? কে না জানে, সে বরং নিজেকে আড়াল করে রেখেছিল আত্মপ্রবঞ্চনার মধ্যে। সাধের ডেইলি প্যাসেঞ্জারির হঠাৎ-মত্ততায়।

শীতের আগে বিশপবাবু ডেইলি প্যাসেঞ্জারি শুরু করেছিল। এবার গ্রীষ্ম এসেছে। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে গ্রহণ করার মতো সুযোগ অনেক ছিল। কিন্তু গাড়ি-চলতি আলাপ, কিংবা কথার পৃষ্ঠে কথা ছাড়া অপর কোন যোগাযোগ তাদের ঘটে নি। সামাজিক সম্পর্কও দানা বাঁধে নি, যদিও তুজনার বসবাস শান্তিপুরের এপাড়া ওপাড়ায়। তবু যা ঘটেছিল, সে তো বাহ্যিক নয়, মানসিক—সচেতনে, বিশেষ করে অবচেতনে ক্রিয়াশীল ছিল একটি মাত্র বস্তুই; তাদের মন। বৈশাম্পায়নকে দেখলেই বিনতার মন বলত, এই সেই মনের মানুষ। বৈশাম্পায়নও যে তা না বুঝত তা নয়—সে-ভাবনা তাকে স্পর্শ করত, বিনতার মোহরস তলে তলে তাকে জারিত করত। বৈশাম্পায়ন তবু কিছু রোজ এক কামরায় না উঠে কামরার পর কামরা চাখত। তারপর শিয়ালদায় নেমে লোক্যাল-গাড়ি-উদ্গীরিত জনতার মধ্যে কি করে যে হারিয়ে যেত, তার হদিস থাকত না। তবু আজ যে সে একান্ত আপনার করে বহুপ্রত্যাশিত সাক্ষাতের সুযোগ পাচ্ছে, সেজন্য মনটি তার আনন্দে ভরে উঠল। বিনতার সঙ্গে নিভৃত সাক্ষাতের আনন্দ!

চৌরঙ্গীর রেস্তোরাঁয় বিনতার পাশে বসে বিশপবাবু খাবার হুকুম করল—মটন চপ, মোগলাই পরোটা, গরম কফি। তারপর ছাইদান টেবিলের দূর কোণে হটিয়ে দিয়ে বিশপ বলল—'আপনার আপিসটি আজ তা হলে কামাই হয়েই গেল, কি বলেন?'

'কিন্তু আমি আপিস করি না তো'—সংক্ষেপেই বিনতা বলল, কিন্তু তারপরই এমন চোখে তাকিয়ে রইল, যেন সবার পক্ষে আপিস না করার কথা বিশপবাবুর বোধ হয় জানা উচিত ছিল।

অবশ্য বিনতা একদিন বলেছিল বটে, আপিসী মেয়ে সে নয়। কিন্তু বিশপবাবু সে কথা ভুলেই গিয়েছিল। তারপর আর কোনদিন কোন প্রসঙ্গ ওঠে নি, বিশপও জানতে চায় নি কোথায় তার কর্মস্থল।

'ইস্কুলে পড়ান বুঝি?' বিশপ এবার প্রশ্ন করল। আপিস না

হলে ইস্কুলই যে এমন মেয়ের কাজের পক্ষে যোগ্য স্থান, সে বিষয়ে তার মনে কোন সন্দেহই ছিল না।

মুখে কথা না বলে শুধু মাথা নেড়ে বিনতা জবাব দিল, ইস্কুলও তার কর্মস্থল নয়। আর তখন উর্দিপরা প্লেট-হাতে বেয়ারা স্বতর্বন্ধ দরজার পাশে থমকে দাঁড়াবার আভাস দিয়ে মৃদু গলায় শব্দ করল। অতিথিদের সামলে নেবার সঙ্কেত আর কি! এটি যেন দরকার— নিজের মান, অন্যের সম্মানের জন্য। রেস্তোরাঁর বেয়ারা জীবনে এই প্রথম একটি কথা ভাবতে লাগল—ভারি ভদ্র জুড়ি তো!

মোগলাই পরটা মুখে পুরে বিশপ বলল—'আপিসও নয়, ইস্কুলও নয়, অথচ আপনার বয়সী মহিলা—'

তার কথা শেষ হবার আগেই বিনতা উৎসুক মুখে বলল—'আমার বয়স আপনি জানেন বিশপবাবু?'

পুরুষের মুখে বয়সের কথা শুনলে মেয়েদের কৌতূহলের সীমা থাকে না। কি জানি, যদি বেশি ভেবে থাকে! বেশি ভাবলে যেন অনেক ক্ষতি!

বিশপবাবু তারই দেওয়া নাম। আবেগপুষ্ট আপন প্রশ্ন নিয়ে আজ যে এই প্রথম বিনতা বিশপবাবু বলল, তা নিজের কাছে বড় বেশি করেই ধরা পড়ল। অথচ আজকের আয়োজিত-সাক্ষাতের পশ্চাতে শুধু ভাবাবেগ নয়, আরও অনেক জটিলতা জড়িয়ে আছে।

বিনতার বয়সের প্রশ্নে কি জবাব দেওয়া যায় বিশপবাবু কিছু পেল না। বেয়ারা ডেকে সে রাজভোগ চাইল।

কিন্তু বিনতা নন্দীর বয়সের হিসাব আগে কি আর বিশপবাবু মনে মনে কিছু কম করেছে? তার প্রথম বিচারে বিনতার বয়স দাঁড়িয়েছিল কুড়ি একুশ। তারপর মানসিক আকর্ষণ যত বেড়েছে, বিনতার বয়স তার কাছে ততই কমে গেছে—। দুমাস আগেও বিশপবাবু নিজের মনে তর্ক করে সাব্যস্ত করেছিল, সতেরো আঠারোর বেশি হতেই পারে না। কে জানে, এখন হয়তো সে ভাবছে, বিনতার বয়স ষোল, চির-প্রেমিকার চিরযোগ্য বয়স—যা কখনও বাড়েও না কমেও না।

এমন নির্জন নিরালায় স্বয়মাগতা সুন্দরীকে এই কথাটি বলতে পারাই যোগ্য প্রেমিকার কাজ। কিন্তু নিজের যোগ্যতা প্রমাণ না করার চেষ্টা না করে মন-প্রেমিকপ্রবর বলল—'স্বয়ং যখন সামনে বসে আছেন। আপনি বলুন।—আমার কাছে মিথ্যা তো আর বলবেন না।'

বিনতার একটি চাপা দীর্ঘশ্বাস বুকফাটা হাহাকারের মতো বেরিয়ে এলো, মনে মনে সে বলল—'এতো বিশ্বাস আমার পরে!' মুগ্ধ বিস্ময়ে মুহূর্তকাল স্তব্ধ হয়ে রইল বিনতা, তারপর বিশপবাবুকে বলল—'জীবনের সব সত্য প্রকাশ করতেই তো আপনার সামনে এসে বসেছি।' মুখ নিচু করে সে নিশ্চুপ বসে রইল।

বিশপবাবুর মনে হল, কোথায় যেন কি একটা খটকা আছে, বিনতার মনে ধাক্কা-খাওয়া কোন ব্যথা হয়তো সঙ্গোপনে লুকিয়ে আছে। যা সে আগে কোনদিনই লক্ষ্য করে নি। বিশপকে চুপ করে থাকতে দেখে বিনতাই আবার মুখ খুলল—'কিন্তু আবার কেন রাজভোগের কথা আপনি বলতে গেলেন? আমি কাজ করি হোটেলে, সুতরাং খাবার—'

'হোটেলে কাজ করেন!' বিশপবাবু বিস্মিত কৌতুহল প্রকাশ করতেই নির্জিত নীরব চোখে বিনতা তাকিয়ে রইল। সে চোখে অনেক কিছুই ছিল।

'কিন্তু কোন্ হোটেলে কাজ করছেন, কি কাজ?' বিশপবাবুর একসঙ্গে একাধিক প্রশ্ন।

আর দেরি করে লাভ নেই ভেবে বিনতা বলল—'মণিগুণের হোটেলে। সেখানে খাই, কাজ—'

'মণিগুণের হোটেলে! কি সব বলছেন!' সীমাহীন বিস্ময়ে বিশপবাবু বলল, তারপর বিনতার দিকে ব্যথিত দৃষ্টি ফিরিয়ে একটি স্বগতোক্তি করল—সর্বনাশ!

এবার সত্যি হতভম্ব হয়ে গেছে বিশপবাবু—মুখে কথা নেই, চোখ নিশ্চল, শ্বাস রুদ্ধপ্রায়। আজ যেন বিশ্ব পৃথিবীর নিশ্চিত শেষ দিন, বিনতার শেষ দিন, তার নিজের শেষ দিন—অথচ শেষ সর্বনাশ

যে কি করে এড়ানো যায়, তা যেন বুঝতে পারা যাচ্ছে না। চরম বিহ্বলতা বিশপবাবুকে কিছুক্ষণের জন্য পেয়ে বসল।

অনেকের মতো বিশপবাবুও মণিগুণকে লোক্যাল গাড়ির কামরায় দেখেছে—মিষ্টভাষী, হাসিখুশি, দয়ার-শরীর লোক। কিন্তু এ তার যাকে বলে বহিরাবরণ—খাপে-ঢাকা মণিগুণ ভিন্ জগতের জীব। তার সম্বন্ধে বরাবর বিশপবাবুব কৌতূহলের অন্ত ছিল না। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত সুযোগও সে পেয়ে গিয়েছিল—তাকে জানবার সুযোগ। এক রকম অপ্রত্যাশিত ভাবেই।

থ্রি হাণ্ড্রেড থারটি ফোর ডাউন শান্তিপুরে সেদিন একদল অ্যাপ্রেন্টিস উঠেছে। নানা কারখানার শিক্ষানবিশ। উঠেই তাদের সে কি হল্লা। হকারদের তারা হেস্তনেস্ত করল, ফল-পাকড়ের ঝুড়ি টেনে ফেলল, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল গিয়ে দরজার মুখে। কামরায় যাত্রী ঢুকতে যাচ্ছে, তারা প্রচণ্ড বাধা দিয়ে বলছে—জায়গা নেই। স্টেশনের পর স্টেশনে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। যাত্রীরা অন্য কামরায় উঠতে যায় তো গাড়ি দেয় ছেড়ে। তা দেখে শিক্ষানবিশ যুবকগুলোর সে কি উল্লাস!

'বলতে পারেন ওরা এমনটি কেন করে?' বিশপবাবুব দিকে চোখ ফিরিয়ে মণিমোহন গুণ শুধিয়েছিল, তারপর নিজেই তার কারণ ব্যাখ্যা করে বলেছিল—'ওরা জীবনে বঞ্চিত। ডবল নীটের প্যাণ্ট পবে আমাদের চলতে দেখে ওরা জ্বলে—হতাশায় হল্লা করে, গরিবের উপর চড়াও হয়, ভেঙে-দাও গুঁড়িয়ে দাও ধ্বনি তোলে। কোলাহল ছাড়া নিজের দৈন্য এত সহজে আর কি করে জাহির করা যায় বলুন!'

কিন্তু সেদিন ছিল মণিমোহনের বক্তৃতা করার দিন। সে আরও একটি আশ্চর্য কথা বলেছিল—'আমি ঐ মস্তানগুলোর কথা কি করে বুঝতে পারি জানেন? সোশাল স্টাডির দ্বারা।' বিস্তৃত ব্যাখ্যা করার দরকার আছে ভেবে মণিমোহন বলেছিল—'এ আমার দারুণ নেশা মশাই। হাটে-মাঠে পথে-ঘাটে চোখ-কান আমার সদা

সজাগ। জানলেন, স্টাডি করে করে ফলাফল আমি নিজের কাজেও প্রয়োগ করি।'

মণিমোহন গুণের সব কথা শুনে বিশপবাবু হতবাক হয়ে গিয়েছিল। 'সোশাল স্টাডির' ফলাফল কি করে আপন কাজে লাগানো যায় বিশপবাবুর মাথায় খেলছিল না। তার ভাবনা বাড়ছিল, কৌতুহল বাড়ছিল, তারপর আরও কিছু আশ্চর্য কথা শুনে মণিগুণের প্রতি সেদিন সে আকৃষ্ট হয়েই পড়েছিল। শেষ পর্যন্ত মণিমোহনের আমন্ত্রণে বিশপবাবু একদিন তার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল ধর্মতলার হোটেলে, যার মালিক স্বয়ং মণিমোহন গুণ। বিশপবাবুর জেনে সেদিন বিস্ময়ের সীমা ছিল না, শুধু পাঁচ-পাঁচখানা হোটেলই নয়, সারা পশ্চিমবাংলায় তার সাতটি বাস, হাজার খানেক রিক্সা, দু হাজার তাঁত চলে। দর্জির দোকান, সিনেমা হল, যাত্রার দলও কমপক্ষে তার আধডজন করে আছে। কিন্তু সর্বাপেক্ষা লাভের কারবার নাকি তার মেয়ে-ব্যবসা। পাঁচটি 'পশ' পতিতালয়ের সে মালিক। এই সব ধনভাগ্যের মূলে নাকি তার সোশাল স্টাডি!

এই কি সেই ট্রেনের কামরায় সখের মেয়ে-গণককে হাত-দেখানো যেচে-চা-খাওয়ানো ভেজা বেড়াল মণিমোহন গুণ! বিশপবাবু বিভোর হয়ে গিয়েছিল। চিন্তায় এবং বিহ্বলতায়। শেষ পর্যন্ত তার সম্বিৎ ফিরেছিল মণিগুণের পরবর্তী কথায়—'রাত আটটা-সাড়ে-আটটার শেয়ালদায় কখনও লক্ষ্য করে দেখেছেন, কত যুবতী মেয়ে শিকার-সন্ধানে ব্যস্ত?'

বিশপবাবুকে হাঁ করে থাকতে দেখে মণিমোহনই জবাব দিয়েছিল—'অনেক মশাই, অনেক—গুণে শেষ করতে পারবেন না। একদিন আমি পুলিসকে কি বললাম জানেন—এই মেয়ে-শিকারী গুলোকে আপনাদের চোখে পড়ে না? পুলিস কিন্তু চমৎকার জবাব দিল—নিশ্চয় পড়ে। কিন্তু জানেন কি, প্রত্যেক মেয়ের রোজ গড়-আয় পঞ্চাশ টাকা। দিন না মশাই, মাত্তর দশ টাকার একখানা করে নোট দিন। খুশি হয়ে সবাই বাড়ি ফিরে যাবে।'

'ব্যাপার কি জানেন বিশপবাবু? আসলে দেহের ব্যবসা বড় কেউ করতে চায় না, তবু করে। অভাবে। সৌখিন খদ্দের এসব ভাল করে জানে বলেই জলের মতো টাকা ছাড়ে। চাল ছড়ালে আবার কাকের অভাব, হেহ্। বাইরের লোকে কি বলে জানেন? বাংলায় একটি জিনিস শস্তা—মেয়ে মানুষ!'

এরপর মণিগুণ বিশপবাবুকে কিছু জ্ঞান দিয়েছিল—'মশাই, লোকের সঙ্গে মিশতে হয়, স্টাডি করতে হয়—মাঝে মধ্যে আলতু-ফালতু দশ-বিশ টাকা খরচা করতে হয়। এতোগুলো প্রতিষ্ঠান যে চালাই, সে তো আব এমনি এমনি নয়।'

সমাজের নানা স্তরেব বহুবিচিত্র লোক-চরিত্র জানতে মণিমোহন গুণেব জুড়ি নেই। রাণাঘাটের বহুপরিচিতা দাইমার কথাই ধরুন। ভদ্রমহিলা অপগত যৌবনা শুভ্রবসনা নিত্যঠাকুরপূজা করা বিধবা। মণিমোহন বলেছিল—'বড় ঘড়েল মা-ঠাকরুণ মশাই। নইলে কি আর সামান্য নার্স থেকে নার্সিং হোমের মালিক হতে পারে? জানলেন, বিহার থেকে কুচবিহার। ঝাড়গ্রাম থেকে মধ্যমগ্রাম পর্যন্ত কমপক্ষে পাঁচশ গর্ভিণী কুমারীকে সে ভারমুক্ত করেছে এবং সেজন্য সে এখন রীতিমতো গর্ব করে বলে—'মেয়েগুলো বিয়ে থা করে এখন যে সুখে শান্তিতে ঘব সংসার করছে, তার পথ কি আমিই পরিষ্কার করে দিই নি!'

'কেনই গর্ব না করবে বলুন?' দাইমার সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষক মণিগুণ বলেছিল—'কিন্তু পাঁচশ মেয়ের তিনশই কি আর আমার হোটেলে 'কাজ' কবে নি?—তারা 'কাজ' করে, ভাই পড়িয়ে, বোন বিয়ে দিয়ে এবং মোটা টাকা জমিয়ে শেষপর্যন্ত নিজেরা বিয়ে করেছে। রাণীর হালে। বুদ্ধিমতী বটে!'

মণিগুণ অবশ্য বলতে ভোলে নি, যারা চিরদারিদ্র্যে ভোগে, দৈহিক রোজগারে ভাইয়ের পড়া, বোনের বিয়ের ব্যবস্থা করে না, আইবুড়ো থাকে অথবা বিয়ে করে গরিব ঘরে গিয়ে কষ্ট পায়, তারা বুদ্ধিমতীর পর্যায়ে পড়ে না!

কিন্তু বুদ্ধিমতী হিসাবে রানাঘাটের দাইমার নাকি তুলনা নেই। কারণ তীক্ষ্ণবুদ্ধির সঙ্গে তার আরও একটি চমৎকার গুণ আছে—পারস্পরিক সহযোগিতার মনোভাব। 'নইলে কি আর আমার হোটেলেই ভর-যুবতীরা বিনা অস্বস্তিতে কাজ করতে পারত, নাকি তার নার্সিং হোমেই গর্ভ-ভার-মুক্তির এতো ভিড় হত!'—মণিগুণ অক্লেশে বলেছিল।

'আপনাকে বলতে দোষ নেই', বিশপবাবুকে আপন লোকের মর্যাদা দিয়ে সে বলেছিল—'সকলের শুভেচ্ছায় শিয়ালদায় মেয়ে-ব্যবসার যে হোটেলটি চালাই, তার জন্য বিস্তর মগজ খরচ করতে হয়। 'কেস' না হলেও ডোমপাড়ার বড়বাবুর দৈনিক দক্ষিণা দুইশ টাকা আগে ঠিক গুণতে হত। কিন্তু কেসের এখন অভাব কি মশাই? এখন কত সুন্দরী মেয়ে পা পা হেটে হোটেলে এসে খোঁজ নিয়ে বলে—আজ কাজ হবে।'

টাকার-কুমীর চতুর ব্যবসায়ী মণিমোহন কিন্তু রাতারাতি পাঁচটি পশ হোটেলের মালিক হয় নি। তার সম্বল ছিল তখন স্বল্প, মাত্র হাজার দুই টাকা। শোভাবাজারের এক অজ্ঞাত গলিতে পাইস-হোটেল খুলে তার হোটেল-ব্যবসার শুরু। তার মস্ত গুণ, উচিত-পয়সায় সে উচিত-খাবার খাওয়াতো। পরিবেশিত খাদ্যের পরিমাণে আর স্বাদে কখনও ঘাটতি থাকত না। ওদিকে হোটেল ঘরের বেড়া না থাকলেই বা কি হবে—তার সুনামের গুণে লোক সেখানে ভেঙে পড়ত। মণিগুণ ক্রমে ফেঁপে উঠল। তারপর শেষ পর্যন্ত একদিন মাত্র সাত হাজার টাকায় মণিমোহন হোটেল-ঘরটি কিনে নিল, আজকে যার দাম কম পক্ষে দেড়লাখ টাকা। এর নাম ব্যবসা।

মণিমোহনের যোগাযোগের পরিধি যে-কত ব্যাপক বিশপবাবু তাও সেদিন জানতে পেরেছিল। এই যোগাযোগ ভাঙিয়ে সে অভাবী ছেলেমেয়েদের চাকুরি-ট্রেইনিং-শিক্ষানবিশীর ব্যবস্থা করত, যার ফলে শুধু ভক্ত সংখ্যাই শুধু তার বৃদ্ধি ঘটত না, হোটেল-ব্যবসার কাজও পরোক্ষ ভাবে লাভজনক হয়ে উঠত।

মণিমোহন বিশপবাবুর সামনেই তার এক মক্কেলকে সেদিন বলেছিল—'ছেলেকে নেভিতে ঢোকাবেন? বেশ কথা। কি বললেন, বয়স পার হয়ে গেছে? আচ্ছা, আমার এই চিঠি নিয়ে চলে যান নোনাপুকুরে। জাহানারা মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল বরকতুল্লা আমার বন্ধু লোক। বড় ভাল মানুষ। সব ব্যবস্থা তিনি করে দেবেন।

কিন্তু কোথায় মাদ্রাসা? শুধু প্যাডের কাগজেই তার অস্তিত্ব—কোন ছাত্র নেই, মাস্টার নেই, জাহানারা মাদ্রাসাব কোন ইমারত নেই। আপনি দেখা করতে যান—দশ-বাই-আট ফুটের ভাড়া-করা ঘরে বসে পিকদান সামনে রেখে পান-খাওয়া লাল দাঁত বের করে বরকত সাহেব খানিক হেসে বলতেন—'মণিবাবু আপনাকে পাঠিয়েছেন তো? হে হে, কর্মী বটে মণিমোহন গুণ—দেশের জন্য দশের জন্য অনেক করেছেন। হে হে হে।'

তাবপব অস্তিত্বহীন জাহানারা মাদ্রাসার স্বনামধন্য প্রিন্সিপাল বরকত সাহেব আবার একটু মিষ্টি-খাওয়া মুখ করে অনাবশ্যক হাসি হেসে বললেন—'কি যেন চাই আপনার? ওহ্ হো, সার্টিফিকেট—হ্যাঁ হ্যাঁ, নিশ্চয় নিশ্চয়। এরপব প্যাডেব উপর কলম রেখে স্তব্ধ হয়ে আপনার দিকে ফিরে চাইবেন—শেষ পর্যন্ত নগদ পঞ্চাশটি টাকা গুণে নিয়ে বয়স-কমানো সার্টিফিকেট তৈরী করতে প্রথমেই তিনি বয়ান লিখবেন—টু-হুম-ইট-মে কনসার্ন!

সমাজের সর্বস্তরের সকল শ্রেণীর লোক নিয়ে মণিমোহন গুণ কাজ করে—ব্যাপক বটে তার সোশাল স্টাডি। এই স্টাডির ফলেই সে একদিন আবিষ্কার করেছিল, নারী নরকের দ্বার নয়, সর্বসিদ্ধির মূল। উৎসাহ উদ্যম নিয়ে সে কাজে লেগে পড়েছিল এবং আপন বিচার বুদ্ধির দৃষ্টিকোণে বিস্তর সিদ্ধি লাভ করেছিল।

ভাবতে অবাক লাগে, ব্যাপক সোশাল-স্টাডি-করা এই মণিমোহন মেধাবী তো নয়ই, বরং নিম্ন মানের ছাত্র ছিল বলে এখনও অনেকে মন্তব্য করে, এমনকি আপন গণ্ডীর লোকও। 'বাবর কে ছিলেন' এই

প্রশ্নের উত্তরে মণিমোহন পরীক্ষার খাতায় দিব্যি লিখেছিল—'উপরে যাহার ছবি দেখিতেছ তাহার নাম জহিরুদ্দিন মহম্মদ বাবর।'

সত্যি বটে মণিগুণের কোন কলেজী বিদ্যা নেই, ডিগ্রী-ডিপ্লোমা কিছুই নেই—কিছু যা আছে, সে তার সদাজাগ্রত বাস্তব বুদ্ধি। এই বুদ্ধিটি প্রখর বলেই হাই-সার্কেলে তার মেলামেশা, সর্বসমাজে তার গতায়াত, মাদ্রাসা-টু-মেডিকেল কলেজে তার পদচারণা। তার পশ-হোটেলে যে বিস্তর ধনীগুণীমানী লোকের পদধূলি পড়ে, তার আপন বাস্তববুদ্ধির খেল। এই বুদ্ধির কাছে বি০ তারা হেরে যায়, বিশপ-বাবুরা হতভম্ব হয়।

স্মৃতিচারণ থেকে মনটিকে টেনে এনে বিশপবাবু বিনতাকে প্রশ্ন করল—'মণিগুণের হোটেলে মেয়েরা যে কাজ করে নিশ্চয়ই তুমি তা কর না?' বিশপবাবু এই প্রথম বিনতাকে 'তুমি' বলল—যেন আপন জন বিপদাপন্ন, তার সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠ, আরও একাত্ম হওয়া এইক্ষণে দরকার।

মণিগুণের হোটেলে যে কি কাজ বিনতা করে বাস্তবিক পক্ষে তা বুঝতে আর বাকি ছিল না, তবু বিশপবাবু তাকে শুধিয়েছিল—তার আপন ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হবে সেই আশায়। সম্মোহিতের মতো বিনতা নন্দী বিশপের দিকে ফিরে চাইল। অবাক হয়ে সে কিন্তু উল্টো প্রশ্ন করতে পারত—সেখানকার কাজের খবর আপনি জানলেন কি করে? কিন্তু তা না করে মাথা নামিয়ে কান্না ভাঙা কণ্ঠে সে বলল—'ঠিক তাই করি।'

বিনতার পক্ষে মণিমোহনের খপ্পরে পড়ার ইতিহাস বড় মর্মান্তিক। হাইয়ার সেকেণ্ডারি পাশ করে সে কলেজেও ভর্তি হয়েছিল—এগোতে পারে নি। কারণ বাবা তখন বেকার এবং সংসার একেবারে অচল। বাবার সংসার। অথচ তার জন্য চিন্তাটা যেন বিনতারই কিছু বেশি, ঠিক আর সব বঙ্গ সন্তানের মতই।

অনেক চেষ্টা করে বিস্তর কাঠখড় পুড়িয়ে বিনতা একদিন একটি

কাজ পেল, শহর কলকাতার পথ-পাশের গুমটিতে হরিণঘাটার দুধ বিক্রীর কাজ—স্বল্পবেতন এবং অস্থায়ী। ব্যাপারটিকে তখন কিন্তু সে একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখছিল—যেন এ তার চাকুরি নয়, অন্য চাকুরির প্রস্তুতি পর্ব। পোশাক-আশাক কেনা, মাদুলি করা, এবং কলকাতায় যাওয়া তো চলে! কলকাতায় না গেলে, খোঁজখবর না নিলে, চালাকচতুর না হলে কি আর ভাল চাকুরি পাওয়া যায়?

সত্যি কলকাতায় সবাইকে যেতে হয়—না গিয়ে কারও উপায় থাকে না। কলকাতা চাকুরের শ্রীক্ষেত্র, বণিকের মক্কা, অধঃপাতের বাইজান্টাইন। এবং কেয়ামতের লীলাস্থল। এইখানে এসে লোকে বাঁচে, মরে, গোল্লায় যায়। পরোয়া নেই। আমাদের কানের কাছে তবু মধুর করে বেজে চলে একটি কথা—চলো কলকাতা!

নিতান্ত অস্থায়ী চাকুরিটি একদিন চলে গেল, কিন্তু বিনতা ডেইলি প্যাসেঞ্জারি করা বন্ধ করল না। কলকাতা যাওয়া তার অব্যাহত রইল। এই কলকাতা-যাওয়া সকালে শর্মিলা রায় যেদিন শান্তিপুর ল্যোকালে বসে মণিমোহন গুণের ভাগ্য গণনা করছিল, অলক্ষ্য বিধাতার মতো মণিগুণ সেইদিনই বিনতার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করে ফেলেছিল। হোটেলের কাজের পক্ষে বিনতা যে খুবই যোগ্যপাত্রী, সে কথা বুঝেই মণিগুণ মনে মনে একটি মহৎ সঙ্কল্প করেছিল—শিয়ালদা হোটেলে বিনতাকে চাই-কি-চাই! আশ্চর্য, বিশপবাবু তখন কাছেই বসে ছিল।

অনেক আশা বুকে নিয়ে বিনতা নন্দী মণিমোহনের দেওয়া ঠিকানায় দেখা করতে গিয়েছিল। মণিমোহন তখনও আশ্বাস দিচ্ছে—'কিচ্ছু ঘাবড়িও না বিনতা, ব্যবস্থা একটা হবেই। কত বড় বড় লোক আমার হোটেলে আসে—তোমার কথা তাদের বলতে কি আর কিছু কম করেছি!'

যত্ন করে চা-জলখাবার খাইয়ে মণিগুণ বিনতাকে আরও বলেছিল—'এগারো নম্বর ঘরে রঞ্জিৎ চাটার্জী রয়েছেন। চা বাগানের মালিক। তোমার কথা বলাই আছে, চল এবার দেখা করবে।'

মণিগুণ এক ফাঁকে দিব্যি তখন কেটে পড়েছে। জুলিয়াস সিজারের মতো টেকো, মধ্যবয়সী, ফরসা ভদ্রলোক খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিনতাকে সেদিন অনেক প্রশ্ন করেছিলেন। যথাযথ জবাবের উপর যে কর্মপ্রাপ্তি নির্ভর করে বিনতা তাই ভাবছিল। কথা বলতে বলতে পায়চারি, পায়চারি করতে করতে রঞ্জিৎ চাটার্জী কথা বলছিলেন—যেন আপন স্টেনোকে ডিক্টেশন দিচ্ছেন, আর মুচকি হেসে মনে মনে বলছেন—এরাই না বলে, কারও ডিক্টেশন আমরা গ্রহণ করি না, এবং পরদিনই গিয়ে শর্টহ্যাণ্ড ক্লাশে ভর্তি হয়।

রঞ্জিৎ চাটার্জী হঠাৎ পায়চারি বন্ধ করলেন, বিনতার চোখে স্থির দৃষ্টি ফেলে সস্নেহে তার কাঁধে হাত রাখলেন, যেন ভাবখানা এই—হ্যাঁ, তুমি পারবে!

এর পর সব কিছুই ঘটল অপ্রত্যাশিত আকস্মিকতায়। বিনতাকে হঠাৎ জাপটে ধরে পাঁজা কোলে তুলে নিয়ে রঞ্জিৎ চাটার্জী এগারো নম্বর ঘরের একমাত্র খাটে শুইয়ে ফেললেন। বিনতার অবাক হওয়ার সময় রইল না, ভাববার সুযোগ হল না,—চিৎকার করার কথা মনেও এলো না। এই প্রথম সে নিজেকে হারাল, এই প্রথম নারীত্বকে।

কিন্তু অবমাননার এখানেই শেষ নয়। অকুস্থলে এবার আরেক ধর্ষকের আবির্ভাব ঘটেছে। সে মধ্যবয়সী নয়, টেকো নয়, তাজা-তরুণ যুবক। পুরুষত্ব প্রমাণ কবাব সুযোগ নিল সে নিষ্ঠুব নিষ্ঠায়। মণিমোহন গুণের কাজের লেকে বটে তো!

শুধু পাশবিক অত্যাচারই নয়, এ যেন নিখুঁত পরিকল্পনা বাস্তবে রূপ দিয়ে বুঝিয়ে দেওয়া, সুন্দরীদের পথে আনার এই হচ্ছে আসল কায়দা। সম্ভবত মণিমোহন গুণ সোশাল স্টাডি কবে করে উপায়গুলো নিজেই উদ্ভাবন করেছিল!

দ্বিতীয়বার বিনতাকে আকর্ষণ করে তার কানের কাছে মুখ নিয়ে রঞ্জিৎ চাটার্জী বলেছিলেন—'কি হে সুন্দরী, এবার কাঁদবে, নাকি চিৎকার করবে? যাই কর, ফায়দা নেই। কেউ উদ্ধার করতে

আসবে না। আর এলেই বা কি? সতীত্ব চিরতরে হারিয়েছ—কাশীতে গেলেও সতীত্ব আর ফিরে পাবে না।'

মণিগুণও তখন রঙ্গমঞ্চে আত্মপ্রকাশ করল। বিনতাকে ফুঁপিয়ে কেঁদে ফেলতে দেখে কুটিল নিষ্ঠুর হাসি হেসে মণিগুণ বলল—'এবার ঢং রাখো দিকিনি। যা হবার তা হয়েই গেছে। এখন তো আর বলতে পারছ না, তুমি সতীলক্ষ্মী মেয়েটি।'

বিনতার সান্ত্বনা পাবার লক্ষণ না দেখে মণিমোহন বক্তৃতা কিছু দীর্ঘতর করল—'আর সতীত্বের সংজ্ঞাটাই বা কি? এই এক ঘণ্টা আগে যে-তুমি ছিলে, সেই-তুমিই আছ—দেহে শুধু একটু আঁচড় লেগেছে বৈ তো নয়। সুতরাং এক হিসেবে নিজেকে তুমি সতী ভাবলে আর কে ঠেকাচ্ছে?'

বিনতা তখনও নিশ্চল পাথরের মতো চুপ করে আছে দেখে মণিগুণ শেষ কৌশল প্রয়োগ করল, একশ' টাকার পাঁচখানা নোট বিনতার আঁচলে বেঁধে দিয়ে বলল—'নাও, আঁচড়ের দাগ মুছতে এবার দেরি হবে না। পথ তো চেনা রইলই। মন চায় তো আবার এসো। কাজের অভাব এখানে নেই।'

বিনতা ভেবেছিল, জীবনে সে আর কোনদিনই কলকাতা-মুখী হবে না। কিন্তু মণিমোহন তা ভাবে নি। সে জানত, মনের চোট আর অপরাধপ্রবণতার ভাবটি কেটে গেলেই সে আবার আসবে, 'কাজে' যোগ দেবে। মণিমোহনের হিসাব যে নির্ভুল, তার প্রমাণ হতে অবশ্য দেরি হয় নি।

শান্তিপুরের বাড়িতে ক'দিন উদ্‌ভ্রান্তের মতো কাটল বিনতার। ভাবনায় সে বিভোর হয়ে রইল। নিজের একাকীত্বের মধ্যে। যা ঘটেছে, কাউকে তা না-বলার, না-আলোচনা করার। অথচ চুপচাপ ভার-মনে কদিনই বা বসে থাকা যায়? করার মতো যখন আর কিছুই রইল না, বিনতার কানের কাছে অবিরাম বাজতে লাগল শুধু কটি কথা—'কাশীতে গেলেও আর সতীত্ব ফিরে পাবে না, যে-তুমি ছিলে, সেই-তুমিই আছ, আঁচড়ের দাগ মুছতে দেরি হবে না।'

কি করি, কোথায় যাই রকমের মানসিক অস্থিরতার মধ্যে বিনতা শেষ পর্যন্ত একদিন থি হাণ্ড্রেড থারটিফোর ডাউন শান্তিপুব লোক্যালে গিয়ে বসে পড়ল—নামল গিয়ে শিয়ালদায়। তখনও কিন্তু নিশ্চিত ধারণা ছিল না, কোথায় তার গন্তব্যস্থল। একমন তাকে বলছিল—চাকুরি নেই, খাবে কি? আবেক মন বলছিল—না খেয়ে মর্। এমনি করে মনেব সঙ্গে অনেকক্ষণ অসহিষ্ণুর মতো যুঝে এবং কোন সিদ্ধান্তে পৌছাতে না পেবে কখন যেন বিনতা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে উঠেছিল মণিগুণের হোটেলে।

আজ ছ' মাস হতে চলল। বিনতার ভাইয়েরা ইস্কুলে যাচ্ছে, বোনের বিয়ের চেষ্টাও চলছে—সংসার আর অচল নয়—কিন্তু মনটি মাঝে মাঝে বিদ্রোহ করে; বিনতা মনে মনে তখন বলে—'আমার দায় পড়েছে সংসারের ঘানি টানতে, ভূতের বেগার খাটতে।' কিন্তু কিছু শান্ত হলেই মনটি আবার বলে—সবাইকে কি আর অকূলে ভাসিয়ে দেওয়া যায়।

সত্যি, পৃথিবীতে বিবেচক লোকের মতো অসুখী কেউ নেই। অপরের সুখ সুবিধার কথা কেবলই যে ভাবে, একে দেখতে হবে, তাকে খাওয়াতে হবে, কিংবা অমুকের জন্য যথোচিত কর্তব্য করা হয় নি ইত্যাদি সদাসর্বদা যে চিন্তা করে, নিজের কথা ভাববার সুযোগ তার হয় না। তুনিয়ায় 'অপর' লোকের শেষ নেই—তাদের দৈন্যের অন্ত নেই, দাবীর সীমা নেই। নেহাত আপন বিবেচনাবোধে সংসারের তাবৎ দায় দাবীর প্রয়োজনীয় অর্থার্জনের ব্যাপারটি সম্প্রতি বিনতার কাছে দাঁড়িযেছিল একটি ক্লান্তিকব রুটিনের মতো—যেতে হয়, তাই যেন সে কলকাতায় যায়, টাইম-টাইম হোটেলে গিয়ে গোণা টাকা নিয়ে ঘবে ফেরে। ঠিকে-ঝিয়ের মতো। কিন্তু কোথায় শান্তি, কোথায় তৃপ্তি। বিবেক বস্তুটি মাবাত্মক রকমে মাথাচারা দিলেই মন বলে—এ আমি কি করছি। তখন আবার তুচারদিন 'কাজ' কামাই করে সে। এমনি প্রচণ্ড মানসিক সংঘাতের এক তুঃসহ মুহূর্তে বিনতার একদিন মনে হল—বিশপবাবুর সঙ্গে একবারটি দেখা করলে কেমন হয়?

বিনতার একটুখানি আশঙ্কা ছিল—বিশপবাবু যদি ভ্রূকুঞ্চন করে, যদি অবজ্ঞায় মুখ ফিরিয়ে বলে—'তোমার যতো সব মহৎ কর্মের ইতিকথা শোনাতেই কি আজ আমার সঙ্গ নিয়েছিলে?'

বিনতার সব কথা শুনে বিশপবাবু নিজের গভীরে ডুবে গিয়েছিল, মনে মনে শুরু করেছিল বিনতা-বিশ্লেষণ—আত্মগ্লানি স্খালনের জন্যই কি বিনতার স্বেচ্ছা-স্বীকৃতি? কিন্তু কেন আত্মগ্লানি? সে তো স্বেচ্ছায় পাপের পথে পা বাড়ায় নি—সমাজ সংসার তাকে বাধ্য করেছিল; মণিগুণদের সমাজ, বাবার সংসার। লোভ নয়, লালসা নয়, ক্ষণিক মোহের পদস্খলনও নয়—নেহাত অবস্থার শিকার বিনতা নন্দী। তাছাড়া কোন আনন্দও সে পায় নি, বরং সদাসর্বদা আত্মদহনে দগ্ধ হয়েছে। সুতরাং কি তার দোষ? বিশপবাবুর বিবেকই তখন জবাব দিয়েছিল—কিছু নয়!

বিনতা আর বিশপবাবু মহানগরী কলকাতার রাজপথে হেঁটে চলেছে। একরকম নিঃশব্দেই। বলার কথা তো অনেক আছে। শোনার কথাও। কিন্তু কোন্‌টি রেখে আর কোন্ কথা বলা যায়, শোনাই বা যায় কোন্ কথা? তাই হয়তো নিঃশব্দ পদযাত্রার পথ তারা অজ্ঞাতসারেই বেছে নিয়েছিল, একে অপরকে না বলে, না জানিয়ে। আত্মস্থ হবার তাগিদ অন্তরে অন্তরে দুজনই বোধ করেছিল—হাঁটা-পথের শুরু থেকেই।

ধর্মতলা, মৌলালী, নীলরতন পেরিয়ে গেছে। মণিগুণের হোটেল দূরে নয়। শেয়ালদার রেল-স্টেশনও কাছে। হঠাৎ বিশপবাবু বিনতার একটি হাত নিজের হাতে টেনে নিল, তারপর আগের মতোই নিঃশব্দে এগোতে লাগল। স্টেশনের দিকে। শেয়ালদার আপদ বালাই থেকে বিনতাকে রক্ষা করবার জন্য তার হাতটি যেন ধরে চলার দরকার আছে।

একটা কথার জবাব যেন না পেলেই নয় তেমন করে বিনতা বলল—'বলতে পারেন বিশপবাবু, এবার আমি কি করব, কোথায় যাব?' ঠিক তখনই শোনা গেল একটি মাইক-ঘোষণা—'একশ' তের

নম্বর আপ শান্তিপুর লোক্যাল পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে পাঁচ নম্বর প্ল্যাটফরম থেকে ছাড়বে।'

বিশপবাবু পূর্ণদৃষ্টিতে বিনতার চোখে চোখ রেখে মৃদু হেসে বলল—'আমি নয় বিনতা, আমরা। এবার আমরা শান্তিপুরে ফিরে যাব। ঘর বাঁধবো। তুমি আর আমি। চিরদিনের মতো।'

স্টেশনের মাইকে তখনও ঘোষণা চলছিল—একশ' তের নম্বর আপ শান্তিপুর লোক্যাল··· !

সমাপ্ত